শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে পালিয়ে

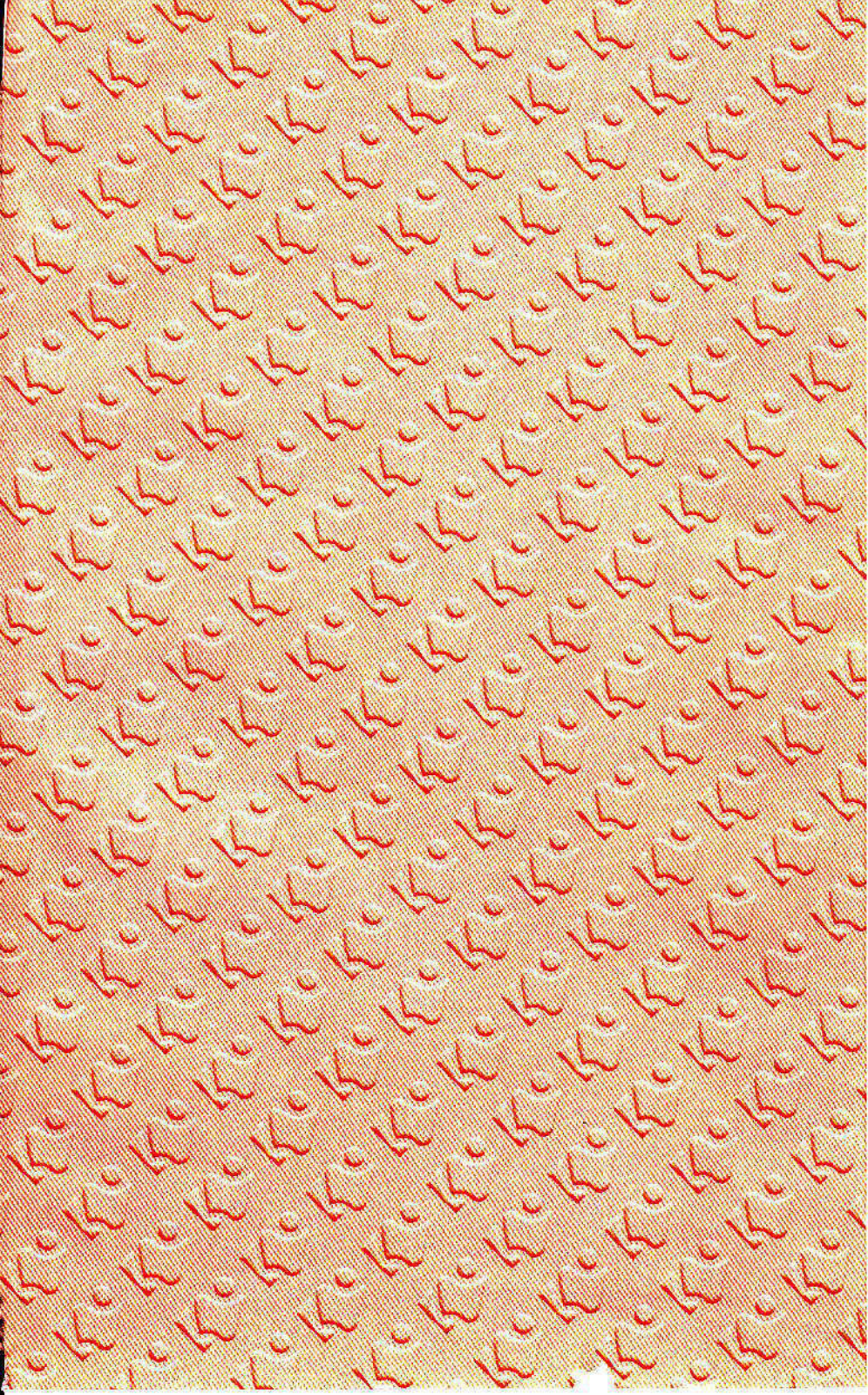

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে পালিয়ে

ভূমিকা
আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৭৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

চতুর্থ সংস্করণ নবম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0272-3

শ্রীমান গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু
জয়যুক্তেষু—

বাড়ি থেকে পালিয়ে ও শিবরাম চক্রবর্তী

একটা সময় ছিল যখন সাহিত্যরসিক মাত্রেই শিবরাম চক্রবর্তী বা শিব্রাম চক্রবরতিকে চিনতেন। বিচিত্র প্রকৃতির ছিল তাঁর লেখাগুলো। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি কথা আপাতত থাক। সে-সব এমন বিচিত্র যে বলে শেষ করা যাবে না! সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নামটা যে কারণে ছড়িয়ে আছে সে-কথাই আগে বলে নেয়া যাক। কারণটা হল প্রধানত হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি। জীবনের শুরুর দিকে তিনি ছিলেন কবি। সেই ১৯২৯ সালে *মানুষ* নামের কবিতার বইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। পরের বইটিও কবিতার, বেরিয়েছিল একই বছর, *চুম্বন* নামে। শরৎচন্দ্রের লেখা *দেনা-পাওনা* উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন *ষোড়শী* নামে। বই যে তাঁর কতগুলো বেরিয়েছিল তার ঠিকঠাক হিসাব কারো কাছে নেই। আর লেখার সংখ্যা? সাধ্য কার খুঁজে বের করে! চেষ্টা করেছিলেন রসিক হায়াৎ মামুদ তাঁর *শিবরাম কিশোর সমগ্র* আর *কিশোর উপন্যাস সমগ্র* সম্পাদনা করতে গিয়ে। তাতে তাঁর কী হাল হয়েছিল দেখা যাক :

> শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাস সংখ্যায় মোট ক'টি এবং সে-সবের ভিতরে কিশোরপাঠ্য আর বয়স্কপাঠ্য-ই বা কোনগুলো ইত্যাদি ভারি এক অঙ্ক কষার ব্যাপার। কিন্তু তারও পূর্বে সমস্ত বই চাক্ষুষ নেড়েচেড়ে দেখা দরকার না? অথচ, তা প্রায় অসম্ভব; কারণ তাঁর বই দুষ্প্রাপ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে বলা চলে। আরও এক সমস্যার কথা বলি। তিনি অনেক গল্প পরপর জোড়া দিয়ে উপন্যাসের আকার দিয়েছেন, তাঁর গল্প বা উপন্যাসের চারিত্র্য এমন যে তা খুবই সম্ভবপর এবং তাতে কাহিনীর গল্পরস ক্ষুণ্ন হয় না। তবে এর ফলে একটা অসুবিধে খুব ন্যায্যভাবেই দেখা দেয় : তাঁর গল্পপাঠকের কাছে কোনো বিশেষ উপন্যাস মনে হতে পারে পূর্বপঠিত, যদিও আগে পড়া হয় নি।
>
> [সম্পাদকের কথা, *উপন্যাস-সমগ্র*, শিবরাম চক্রবর্তী; হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত]

সংক্ষেপে তাঁর জীবন-তথ্যের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক। কিন্তু তাই- বা কী করে সম্ভব? নিজেই যে তিনি বলেছেন,

> সার্কাসের ক্লাউন যেমন। সব খেলাতেই ওস্তাদ, কিন্তু তার দক্ষতা হোলো দক্ষযজ্ঞ ভাঙার। সব খেলাই জানে, সব খেলাই পারে, কিন্তু পারতে গিয়ে কোথায় যে কী হয়ে

যায়, খেলাটা হাসিল হয় না; হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়। কিন্তু আমি তা পেরেচি কি?

(নিজের সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডের *শিব্রাম রচনাবলী* বইয়ের ভূমিকা)

নিজেকে নিয়ে যা-ই লিখেছেন তার মধ্যে যে কোনটা ছিল ব্যঙ্গ আর কোনটা ছিল সত্য তা বলা কঠিন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই আছে দুটি। একটি *ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা* (১৯৭৪), অন্যটি *ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর* (১৯৯৬)। আয়তনে মহাকায়ই বলা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও হায়াৎ মামুদের মতে,

> তারপরেও তাঁর জীবন একরকম অজ্ঞাতই থেকে যায় আমাদের কাছে। কারণ তাঁর যাপিত জীবনের আনুপূর্বিক বয়ান সেখানে নেই। আরও মুশকিল, ঐ বই দুখানি থেকে কালানুক্রমিক ঘটনা-পরম্পরা তৈরি করাও সম্ভব নয়—ধারাবাহিকতার ফাঁক-ফোকর এতখানিই যে অলীক কল্পনার আশ্রয়েও সে-সব ভরাট করা যায় না।

অর্থাৎ নিজেকে কীভাবে জাহির করতে হয় তা চিরকালের অবৈষয়িক শিবরাম চক্রবর্তী জানতেনই না। তা হলে কী করে তাঁর সত্যিকারের জীবনপঞ্জি গড়ে তোলা যাবে? তা সত্ত্বেও তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি তৈরি করার চেষ্টা করা যাক। আর এ ব্যাপারে প্রথমেই শরণ নেয়া যাক তাঁর সাত্ত্বিক, ভবঘুরে, সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ পিতা শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা জন্মবৃত্তান্তের। শিবরামের জন্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

বঙ্গাব্দ তের শ দশ প্রাতে রবিবার
সাতাশে অগ্রহায়ণ শিবের কুমার
শিবরাম জনমিল লীলা শঙ্খ বাজাইল
শিবহৃদে উপজিল আনন্দ অপার

অর্থাৎ ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২৭ অগ্রহায়ণ রবিবার খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিকাতে ১৯০৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর হয়। শিবরামের মায়ের নাম শিবরাণী দেবী। তিন ভাইয়ের মধ্যে শিবরামই বড়। বোন ছিল না। মালদহের সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে পড়েছেন। সেখানে ১৯১৯ সালে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চলে এলেন কলকাতায়। তাই ওখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠেনি। ম্যাট্রিক অবশ্য পাস করেছিলেন পরে কলকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর অন্তর্গত গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে। এই স্কুলটি গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবীরা। এর প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এখানে তাঁর থাকা-খাওয়া-লেখাপড়া সবই ছিল ফ্রি। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বইয়ের পোকা, খেলাধুলায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না। স্কুলে পড়বার সময়ই হাতে-লেখা পত্রিকা বের করতেন।

রাখার কাজ চলত দেয়াললিখন দিয়ে। চুনকাম-করা সাদা দেয়ালে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে রাখতেন। দুবার জেল খেটেছেন। একবার স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে, আর একবার 'যুগান্তর' সম্পাদনার দায়ে। মৃত্যুশয্যায় থাকাকালেও কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিয়েছেন 'ফাসকেলাস, মারভেলাস'। জীবনের একেবারে শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেও তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর জীবনের যেসব তথ্য দেয়া গেল তার বেশিরভাগই পাওয়া গেছে অন্যদের লেখা থেকে। সব তথ্য ভালোভাবে যাচাই করবার উপায় নেই। কোনো অভিনিবিষ্ট গবেষক হয়তো তাঁর জীবনের সঠিক তথ্যগুলো একদিন খুঁজে বের করবেন।

শিবরাম চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে বিশ শতকের একজন সেরা লেখক। তাঁর ভাবুক সত্তাকে শিবনারায়ণ রায়ের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তিনি শিবরামের *মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী* (১৯৪৩), *আজ ও আগামীকাল* (১৯২৯), *দেবতার জন্ম [ও অন্যান্য গল্প]* (১৯৪৭) ইত্যাদি রচনাকেও খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু হাসির গল্পের লেখক হিসেবে পাঠকদের এত নৈকট্য তিনি লাভ করেছেন যে ভাবুক সত্তা আড়ালে পড়ে গিয়েছে। তাঁর হাস্যরসিক সত্তার অনুরাগীদের একযোগে খুঁজে পাওয়া যাবে পণ্ডিত ও কিশোর সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যেই।

আগেই বলেছি শিবরামের বইয়ের সংখ্যা ঠিক কয়টি তা বলা শক্ত। হায়াৎ মামুদ একটা অসম্পূর্ণ কিন্তু গুরুত্ববহ কাজ সমাপ্ত করেছেন, চেষ্টা করেছেন তাঁর বইগুলোর হদিস খুঁজে বের করতে। তিনি বলেছেন,

> 'যেমন জীবন সম্পর্কে তেমনি নিজের লেখা ব্যাপারে তিনি নির্মোহ মানুষ ছিলেন।... আসলে রুটিনমাফিক কাজ, অনুপুঙ্খতা, বিন্যাস-পারিপাট্য ইত্যাদি সম্ভবত তাঁর ধাঁচে ছিল না। তা ছাড়া, কেবলমাত্র লেখার সম্মানী দিয়ে তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহ টিকিয়ে রাখতে হয়েছিল বলে অজস্র রচনা তাঁকে নিত্য লিখতে হয়েছে: ছোট-বড়-মাঝারি, গুরুগম্ভীর বা হালকা চালের, গদ্য-পদ্য-রম্যরচনা-ফিচার ইত্যাদি কত কী; আর সে-সবের হিসেব রাখা আত্মরচনাপ্রেমে মত্ত মানুষ ছাড়া কার পক্ষেই-বা সম্ভব!'

অনেক চেষ্টায় তিনি তার একটা মোটামুটি গ্রন্থপঞ্জি রচনা করেছেন। এখন পর্যন্ত এটাই নির্ভরযোগ্য। তবে আমরা এখানে সব বইয়ের নাম দিচ্ছি না। মোটামুটিভাবে পরিচিত অধিকাংশ বইয়েরই নাম দিচ্ছি। কারণ আগেই বলা হয়েছে তাঁর রচনা নিয়ে নিজেই নানা রূপের কারুকর্ম তো করেছেনই, সুযোগ পেয়ে ব্যবসায়ীরা করেছেন আরো বেশি : কয়েকটি বই থেকে রচনা বেছে নিয়ে গড়ে তুলেছেন আরেকটি বই। এমনি করে অনেক বই বেরিয়েছে তাঁর। এখানে যে কটি বইয়ের নাম উল্লেখিত হবে তার মধ্য থেকে তাঁর বইয়ের নামকরণের

পরে সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের উৎস। কিন্তু ঘড়ি ধরে নিয়ম মানা চাকরি কখনো করেননি। সে অর্থে বলতে গেলে সাংবাদিকতাও করেননি। ১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে দেয়া তাঁর বক্তব্য তুলে দিয়েছেন হায়াৎ মামুদ তাঁর সম্পাদিত *কিশোর উপন্যাস-সমগ্র* বইয়ে। সেখানে শিবরাম বলছেন,

> সাংবাদিকতা নয়, সংবাদপত্রকে ঘিরেই আমার জীবন। বাড়ি পালানো ছেলে আমি, খুব ছেলেবেলা থেকেই *বসুমতী* ফিরি করতাম। মনে পড়ে এক পয়সা করে দাম ছিল *বসুমতী*র। আমি সোজা চলে যেতাম বেথুন কলেজের সামনে। জানতাম, মেয়েদেরও প্রাণ মায়েদের মতো। নিমেষে সব *বসুমতী* বিক্রি হয়ে যেত। সোজা চলে যেতাম সিমলার রাবড়ির দোকানে। সেখানে ছ'পয়সার রাবড়িতে পেট ভরিয়ে তবে যেতাম *বসুমতী* অফিসে। নেশা যদি করতে হয় তবে রাবড়ির নেশা করাই ভালো। হায় এখন আর তেমন রাবড়ি পাওয়া যায় না।

শিবরাম একবার একটা বইয়ের দোকান দিয়েছিলেন, নাম 'শিবরাম চক্কোত্তির বইয়ের দোকান'। নিজে বসতেন না, চালাতেন তাঁর পুত্রকন্যাপ্রতিম কেউ কেউ। পশ্চিমবঙ্গে এখনো বহুল প্রচারিত, এককালের বিপ্লবী ভাবধারার দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা তিনিই বের করেছিলেন। পরে মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে তুষারকান্তি ঘোষের কাছে বিক্রি করে দেন। অবশ্য *শিরোনাম শিবরাম* নামে শিবরাম-বিষয়ক বই সম্পর্কে শিবনারায়ণ রায় তাঁর নিজের সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় আলোচনা করতে গিয়ে 'তুষারকান্তি যে শিবরামের কাছ থেকে টাকা দিয়ে "যুগান্তর" নামটি কিনে নিয়েছিলেন তার কি কোনো প্রমাণ আছে' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাসের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' সম্পাদনা করেছিলেন কিছুকাল। কিছুদিন চালিয়েছেন 'কৃষিতত্ত্ব' নামে একটি পত্রিকা।

কৈশোরকালের প্রেম পরিণতি পায়নি। আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন সৌখিন। ছিলেন ভোজনরসিকও। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। চাঁচল রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সে বিষয়-সম্পত্তির কিছুই জোটেনি। কিন্তু কোনো বঞ্চনাই তাঁকে কাঁদাতে পারেনি। উল্টো সকলকে সারাজীবন হাসিয়েছেন। থাকতেন ১৩৪ নং মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের এক মেসবাড়িতে, দোতলার একটি ঘরে, ১৯২৯-এর আশপাশের কোনো এক সময় এসে উঠেছিলেন, এখানেই কাটিয়েছেন মৃত্যুর আগে কলকাতার শেঠ শুকলাল কার্নানি মেডিকেল হাসপাতালে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, (মৃত্যু : ১৯৮০ সালের ২৮ আগস্ট, বিকেল ৩.৩৫-এ), জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর। পরিহাস করে লিখেছিলেন : 'মুক্তারামে থাকা, তক্তারামে শোওয়া আর শুক্তারামে ভক্ষণ'। বিলাসিতা যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা আলস্য আর নিদ্রা। প্রচুর সিনেমা দেখতেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি আর টেলিফোন নম্বর টুকে

বৈশিষ্ট্য, তাঁর যমকালঙ্কারপূর্ণ গদ্যভাষার অসাধারণ রূপের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন [গল্প] : *পঞ্চাননের অশ্বমেধ* (১৯৩৫), *শুঁড়-ওলা বাবা* (১৯৩৫), *মন্টুর মাস্টার* (১৯৩৬), *কালান্তক লাল ফিতা* (১৯৩৭), *ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি* (১৯৩৭), *মালাইবরোফ* (১৯৩৮), *যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন* (১৯৩৮), *পাত্রপাত্রী সংবাদ* (১৯৩৯), *বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি* (১৯৩৯), *মামার জন্মদিন* (১৯৩৯), *হর্ষবর্ধন অপহরণ* (১৯৩৯), *হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি* (১৯৩৯), *ফুটবলের দৌড়* (১৯৪০), *মধুরেণ সমাপয়েৎ* (১৯৪০), *অমার ভূত দেখা* (১৯৪১), *বুবুম বুবুম বুম* (১৯৪১), *মেয়েদের মন* (১৯৪১), *প্রেমের বি-চিত্র গতি* (১৯৪২), *ভারী বিপর্যয় ব্যাপার* (১৯৪২), *শঙ্কর আমাদের সব পারে* (১৯৪২), *হাওড়া-আমতা রেলের দুর্ঘটনা* (১৯৪২), *মানুষের উপকার করো* (১৯৪৩), *মৃত্যুর মুখোমুখি* (১৯৪৪), *শিবরাম চক্রবরতির মতো কথা বলার বিপদ* (১৯৪৫), *আত্মীয় বজায় রাখা সোজা নয়* (১৯৪৭), *প্রেমের পথ ঘোরালো* (১৯৪৭), *বিনির কাণ্ড কারখানা* (১৯৪৭), *বিশ্বপতির অশ্বমেধ* (১৯৪৭), *প্রেমের প্রথম ভাগ* (১৯৪৮), *বন্ধু চেনা বিষম দায়* (১৯৪৮), *ভূত অদ্ভুত* (১৯৪৯), *লাকড়ি আউর লক্কর* (১৯৪৯), *বড়দের হাসিখুশি* (১৯৫১), *হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ* (১৯৫১), *নিখরচায় জলযোগ* (১৯৫৩), *প্রাণকেষ্টর কাণ্ড* (১৯৫৪), *ভুতুড়ে অদ্ভুতুড়ে* (১৯৫৪), *হাস্নুহানা* (১৯৫৪), *চকরবর্তিরা কঞ্জুস হয়* (১৯৫৭), *যত হাসি তত মজা* (১৯৫৭), *আমার ভালুক শিকার* (১৯৫৮), *জন্মদিনের হাসিখুশি* (১৯৫৮), *ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা* (১৯৫৮), *মামা ভাগ্নে* (১৯৫৮), *রসময় যার নাম* (১৯৫৮), *প্রেমের কথামালা* (১৯৫৯), *ভালবাসার ইতিকথা* (১৯৫৯), *ভালো ভালো গল্প* (১৯৫৯), *পঞ্চরঙ* (১৯৬০), *হিপ হিপ হুররে* (১৯৬০), *পেয়ারার স্বর্গ* (১৯৬০), *হাসির গল্প* (১৯৬১), *হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন* (১৯৬২), *আজ কি মজার দিন* (১৯৬৩), *তোতাপাখির পাকামি* (১৯৬৩), *স্ত্রী মানেই ই-স্ত্রী* (১৯৬৩), *দুর্ঘটনা বলতে নেই* (১৯৬৪), *মনের মতো মেয়ে* (১৯৬৪), *চোরের পাল্লায় চকরবরতি* (১৯৬৬), *হাসির টেক্কা* (১৯৬৬), *অদ্বিতীয় পুরস্কার* (১৯৬৬), *নাক নিয়ে নাকাল* (১৯৬৭), *প্রজাপতয়েঃ* (১৯৬৭), *গল্প বলি গল্প শোনো* (১৯৬৭), *অনেক হাসি* (১৯৬৮), *দুষ্টু প্রজাপতি* (১৯৬৮), *ভালোবাসার অনেক নাম* (১৯৬৮), *হর্ষবর্ধনের নানান কাণ্ড* (১৯৭৭), *করেককাশির গোয়েন্দাগিরি* (১৯৭৯), *লাভের বেলায় ঘণ্টা* (১৯৭৯), [উপন্যাস] *কলকাতার হালচাল* (১৯৩৬), *বাড়ি থেকে পালিয়ে* (১৯৩৭), *কাকাবাবুর কাণ্ড* (১৯৩৭), *বাঁটুলের ভবনে হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন* (১৯৩৮), *কৃতান্তের দন্তবিকাশ* (১৯৪০), *মেয়েদের ফাঁদ* (১৯৪৭), *কে হত্যাকারী* (১৯৪৪), *বর্মার মামা* (১৯৪৪), *মনের মতো বউ* (১৯৪৬), *গরু ছিল ঋষি* (১৯৫১), *চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন* (১৯৬২), *দাদু নাতির*

দৌড় (১৯৬২), *অথ বিবাহ ঘটিত* (১৯৬৩), *খুনীকে নিয়ে খুনোখুনী* (১৯৬৭), *ইতুর থেকে ইত্যাদি* (১৯৬৮), *পথ থেকে হারিয়ে* (১৯৬৮), *প্রাণ নিয়ে টানাটানি* (১৯৬৮), *কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন* (১৯৭০), *প্রণয় বিচিত্রা* (১৯৭২), *বাড়ি থেকে পালিয়ে পর* (১৯৭২), *এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী* (১৯৭৫), *গুম্ফবতী* (১৯৭৫), [রম্যরচনা] *আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না* (১৯৫১), [নাটক] *বাজার করার হাজার ঠেলা* (১৯৪০), *যখন তারা কথা বলবে* (১৯৪৯) *পণ্ডিত বিদায়* (১৯৫৫), *শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুনাট্য* (১৯৬৬) [কিশোর সংকলন] *জন্মদিনের উপহার* (১৯৫৩) (প্রবন্ধ] *ফানুস ফাটাই* (১৯৬০)।

শিবরামের সমগ্র সৃষ্টিকর্মের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই রচনাটির অভিমুখ্য নয়, *বাড়ি থেকে পালিয়ে* উপন্যাসের সূত্রে হাস্যরসিক শিবরামের সাহিত্যিক সত্তাকেই অংশত এখানে অনুসন্ধান করা হবে। শিবরামের প্রথম উপন্যাস *বাড়ি থেকে পালিয়ে* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। উপন্যাসটিকে অবলম্বন করে বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক একই নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ঐ ছবিটিও বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ছবি হয়ে টিকে আছে।

এই উপন্যাস যখন লেখা হচ্ছে যে-সময়ে নগর-জীবন নিয়ে, গ্রাম ও নগর জীবনের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্প লেখা চলছে। কিন্তু শিশুসাহিত্য তখনো প্রধানত রূপকথা-উপকথা-কিংবদন্তি-রহস্যকাহিনীতে বৃত্তাবদ্ধ। আধুনিক জীবনের সংকট বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্যে তখনো তেমন ভাবে আসতে শুরু করেনি। *বাড়ি থেকে পালিয়ে*-র প্রথম প্রকাশের সময়ই বোঝা গিয়েছিল এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা। একটি শিশুর বিস্ময়ভরা চোখ দিয়ে এই উপন্যাসে গ্রাম ও শহর, জীবনকে দেখেছেন শিবরাম। গ্রামের সরল প্রকৃতির মধ্যে জন্ম নেয়া ও বেড়ে উঠতে থাকা একটি শিশুর জীবনকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি। পটভূমিতে রয়েছে বিশ শতকের তিরিশের দশকের কলকাতা নগর। শহর কলকাতা তখনই একটি সম্পন্ন নগরের রূপ পেয়ে গেছে। জীবন আক্রান্ত হতে শুরু করেছে নাগরিক জটিলতায়। গ্রাম ও নগরে জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির স্পর্শে উজ্জীবিত কলকাতা সম্পর্কে গ্রামের মানুষের মনে যেমন জেগে উঠছে বিস্ময় তেমনি নগরজীবনের মানুষের মধ্যে তাচ্ছিল্য। এই মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

বাড়ি থেকে পালিয়ে উপন্যাসে নাগরিক এই জটিলতাকে দেখা হয়েছে যেন পাশ থেকে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঞ্চন খুব ডানপিটে একটি ছেলে। কলকাতা তার কাছে নতুন একটি জায়গা। গ্রামের সরল দৃষ্টিতে নগরজীবন তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঠেকেছিল। নগরের অনেক কিছুই তার মধ্যে জাগিয়েছিল

বিস্ময়। দুষ্টুমি ও বিস্ময়ভরা চোখে তার দেখা গ্রামজীবনের সঙ্গে নগরজীবনের সুন্দর ও কুৎসিতকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল। এরই মধ্য দিয়ে রসঘন হয়ে উঠতে পেরেছে উপন্যাসটি। শিশুর বিস্ময়ভরা চোখে দেখা জীবন হয়তো বাংলাসাহিত্যে আরো পাওয়া যাবে, কিন্তু গ্রাম ও নগরজীবনকে এমন কৌতুকরসপ্রবাহী সমালোচক-সত্তার দৃষ্টিতে দেখা উপন্যাসে সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না। সে কারণে হয়তো এ-কথাও বলা চলে যে, বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসের কোনো পূর্বসূরি যেমন নেই, তেমন নেই উত্তরসূরিও।

এই উপন্যাসের ঘটনাবলিতে রয়েছে অনেক আকস্মিকতার ছড়াছড়ি। এইসব আকস্মিকতাকে হয়তো কেউ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। তাদের কাছে মনে হতে পারে অতিকল্পনা। কিন্তু একটু ভালোভাবে লক্ষ করলেই অনুভব করা যাবে যে ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যে এই ধরনের আকস্মিকতা থাকাই স্বাভাবিক। জীবনের নিষ্ঠুরতাগুলোকে সাধারণত শিশুসাহিত্যে খুব বেশি রকম বীভৎসভাবে দেখানো হয় না। সঙ্গত কারণেই শিবরামও কলকাতা শহরে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিশোরবয়সী কাঞ্চনকে সহজেই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন। মিলনাত্মকভাবেই শেষ হয়েছে কাহিনী।

কাঞ্চনের মা চরিত্রটি সরল হৃদয়ের স্নেহোৎকণ্ঠাপূর্ণ পুত্রবৎসল এক জননী। বাবা-মায়ের মনে যেমন তার সন্তানের জন্য বাৎসল্য উছলে পড়ে তেমনি সন্তানের মনেও থাকে বাবা-মায়ের প্রতি গভীর মমতা ও ভালোবাসা। একটা কিশোরের কয়েকটি দিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এই উভমুখি মানবিক প্রবণতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। অবশ্য যমক অলঙ্কারপূর্ণ যে ভাষার জন্য শিবরাম বিখ্যাত সেই ভাষা এই উপন্যাসে পুরোপুরি দেখা না গেলেও মৃদু হাস্যরসের ধারা বহমান থেকেছে।

আহমাদ মাযহার
মার্চ ২০০৬

এক

বিনোদের সঙ্গে কাঞ্চনের কিছুতেই বনত না। বিনোদ তাদের পুরুতের ছেলে, তাদের ঠাকুর শালগ্রামের পুজো সে-ই করে। বোধ করি দেবতার ভোগের ভাগ নিয়েই তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়।

কাঞ্চনের বয়স তেরো-চোদ্দর বেশি নয়, কিন্তু সেই বয়সেই তার মতো দুষ্টু—দুর্দান্ত ছেলে পাড়ায় দুটি ছিল না। তার মুহুর্মুহু খিদেও পেত যেমন, তেমনি সেই খিদেকে কাজে লাগাবার উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল তার অসাধারণ। ঘরের যা-কিছু খাবার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সে তো আত্মসাৎ করতই, ঠাকুর এবং বিনোদের অংশেও ভাগ বসাতে ছাড়ত না। পুজোর আগে ঠাকুরঘরে গিয়ে যখন তার রাজভোগ থেকে রাজকর সহজেই গ্রহণ করত, তখন পাথরের দেবতা প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতেন না বটে, কিন্তু পুজোর শেষে নিজের অংশ থেকে কিছু ছাড়তে রক্ত-মাংসের মানুষ বিনোদের অত্যন্তই আপত্তি ছিল।

সেদিন স্নান করতে গিয়ে কাঞ্চন এর শোধ নিলে। বিনোদকে সাঁতার কাটতে মাঝ-পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতরে তার মাথা চেপে ধরল। সাঁতার ভালো জানলেও এবং বয়সে কাঞ্চনের চেয়ে কিছু বড় হলেও বিনোদ গায়ের জোরে তাকে আঁটতে পারত না। খানিকক্ষণেই হাঁপিয়ে, এক-পেট জল খেয়ে বিনোদ যায় আর কী! তখন কাঞ্চন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—"কেমন জব্দ! আর আমার সঙ্গে লাগবি?"

বিনোদের রাগ ততক্ষণে মাথায় চড়েছে। যতক্ষণ-না এক-কোমর জলে এল, ততক্ষণ সে একটি কথাও বলল না; কিন্তু তীরে পৌঁছেই তার তৈল-জীর্ণ ময়লা পৈতেখানি ছিঁড়ে কাঞ্চনকে এই বলে শাপ দিল যে, ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্যি হন, তবে কক্‌খনো তার বিদ্যে হবে না। ফি-বছরই সে পরীক্ষায় ফেল করবে।

এই সুকঠিন অভিশাপে কাঞ্চনের মুখ এতটুকু হয়ে গেল; ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা সে ভাবেনি, তবুও জোর করে বলল—"তোর শাপে আমার কচু হবে!"

এতে বিনোদ কেঁদে ফেললে—"দে, আমার পৈতে খুঁজে দে!"

"এখন কান্না হচ্ছে! ছিঁড়তে গেলি কেন? আমি যাব খুঁজতে—ভা-রি দায় আমার!"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জলের তলা থেকে উদ্ধার করে বিনোদ গিঁট দিয়ে পৈতে পরল।

"ছিঁড়ে গিঁট দিতে গেলি যে বড়? ভা-রি ব্রহ্মণ্যদেব!"

"বাহ্, আমি পৈতে না পরে যাই, আর বাবা আমাকে ধরে ঠ্যাঙান। তুমি তো ঐ চাও!"

সেইদিনই।

কাঞ্চনের বাড়ি পুজো সেরে আমবাগানের পথে বিনোদ ফিরছে। কাঞ্চন তাকে ধরল—"দাঁড়াও!" একহাতে ক্ষীরের বাটি, অন্যহাতে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ভীতনেত্রে বিনোদ বললে—"কী আবার?"

কাঞ্চন এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, বললে—"তোমার শাপ কাটান দাও!"

বিনোদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে—"দ্যাখ্ কাঞ্চন, শাপ আর কাটান যায় না। ব্রহ্মবাক্য—যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, তা রদ করা ব্রহ্মারও সাধ্যি নয়!"

"হ্যাঁ, নয় আবার! আমি এত পড়ে শুনে ফি-বছর ফেল হতে থাকব, আর তুমি ফাঁকতালে পাস করে মজা লুটবে, সে হচ্ছে না! বলো আগে—"

"সে হবার নয় কাঞ্চন, আমি ভেবে দেখলাম। শাপ উল্টে গেছে— শাস্ত্রে এমন কোথাও লেখেনি। তাহলে পরীক্ষিৎ—"

"রেখে দাও তোমার পরীক্ষিৎ! শাপ যদি না-কাটান দাও তবে ঐ ক্ষীরের বাটি, আর দইয়ের ভাঁড় দিয়ে যাও!"

বিনোদ এবার গুরুতর সমস্যায় পড়ল। একদিকে শাস্ত্রের নজির, অন্যদিকে ক্ষীরের বাটি। এই উভয়-সঙ্কটে সে মাথা খাটিয়ে বলল—"শাপ তো কাটান যায় না রে! তবে এই বলছি, বিদ্যে তোর না-হোক, বুদ্ধি তোর খুব হবে! তাতেই তোর পুষিয়ে যাবে বুঝলি কাঞ্চন! বামুনের বর, তা-ও মিথ্যে হবার নয়।"

বিদ্যা ও বুদ্ধির তারতম্য কাঞ্চনের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সে এক ঝটকায় দইয়ের ভাঁড় টেনে নিয়ে সমস্ত দই বিনোদের মাথায় ঢেলে দিল; অবশেষে ক্ষীরের বাটিটা কেড়ে নিয়ে এক আমগাছের ডালে উঠে বসল। বিনোদের দিকে আর দৃষ্টিপাত না-করে পা দোলাতে দোলাতে যে আপাতমধুর বস্তুটি তার হস্তগত হয়েছিল, সেই বিষয়ে একান্ত মনঃসংযোগ করল।

ভাঁড় টেনে নিয়ে সমস্ত দই বিনোদের মাথায় ঢেলে দিল

দুই

বিনোদ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। খানিক পরেই বাড়ির চাকর কাঞ্চনের খোঁজে দেখা দিল—"ছোটবাবু, বাবা তোমায় ডাকছেন।"

চাপা-গলায় কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"কেন রে!"

"বিনোদ ঠাকুর—"

"কী বলেছে সে, শুনি?"

"তুমি নাকি পুজোর আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরের ভোগ খেয়ে রাখো, তারপরে একদিন নাকি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ঠাকুর-পুজো করতে দাও নি—"

"এইসব বলেছে! পাজি কোথাকার! আচ্ছা, দেখব তাকে আমি—"

"আবার আজ নাকি তুমি তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছ! মাথায় দই ঢেলে—"

"মিথ্যে কথা! আমি পৈতে ছিঁড়েছি? বলুক দিকি সে! ওর ওই ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে বলুক! ও-ই তো আমাকে শাপ দিলে! আর দই ঢেলেছি? বেশ করেছি, কাল ঘোল ঢালব। দেখি কী করে ও!"

"বাবু তোমাকে এক্ষুনি ডাকছেন! মালখানা থেকে সেই রুপো-বাঁধানো চাবুকটাও বের করেছেন।"

"বা রে! সে তো আমার চাবুক! আমার পিঠেই পড়বে নাকি?"

"তা কী জানি বাবু! এখন তো চলো, তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠালেন।"

"দেখছিস না, আমি খাচ্ছি! যা তুই, আমি যাব এখন।—হ্যাঁ রে, মা কোথায় রে?"

"মা কাঁদছেন। তোমাকে আদর দেন বলে বাবা তাঁকে খুব বকেছেন।"

"যা যা, এখন যা। বিরক্ত করিস নে। রাগ হয়ে গেলে এই বাটি তোর মাথায় ছুড়ে ভাঙব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

"আমি তো যাচ্ছি, মা-ঠাকরুন আমাকে চুপি চুপি বলে দিলেন, কর্তাবাবু খেয়ে-দেয়ে ঘুমোবার আগে তুমি যেন বাড়ি ঢুকো না, বুঝলে?"

"যা যা, তোকে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না।"

চাকর হাসতে হাসতে চলে গেল। কাঞ্চন ভাবতে লাগল, এখন সে কী করে? বিনোদ যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা কি সে কোনোদিন ভেবেছিল! যাই হোক, কাঞ্চন আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল যে বিনোদ কেমন স্বার্থপর। সামান্য একবাটি ক্ষীরের জন্যে—নাহ্, আর কক্‌খনো সে অমন ছেলের সঙ্গে মিশবে না। কিন্তু এখন—এখন কী করা?

গাছ থেকে নেমে আমবাগানের পাশ দিয়ে যে বাঁধানো রাস্তাটা গেছে, তাই ধরে সে হাঁটতে শুরু করল—যেদিকে দু-চোখ যায়। কতক্ষণ সে চলেছে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। অবশেষে যেখানে পথ শেষ হল, সেটা রেলস্টেশন।

একটু বাদেই একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। কাঞ্চন একটুক্ষণ কী ভাবলে, তারপর লোকজন কম এইরকম একটা কামরা বেছে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চলেছে। কোথায় যাচ্ছে, কিছুই সে জানে না। কয়েকটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। কত লোক উঠল—নামল; কিন্তু কেউ তাকে একটি প্রশ্নও করল না। অবশেষে একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়াতেই একটি ভদ্রলোক তাকে জিগ্যেস করলেন—খোকা, নামবে না?"

"এটা কী স্টেশন?"

"বর্ধমান। এ-গাড়ি এখানেই দাঁড়াবে, আর যাবে না।"

অতএব তাকে নামতে হল। ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন—"কোথায় যাবে তুমি?"

সে একটু ভেবে বললে—"কলকাতায় যাব।"

"কিন্তু এ গাড়ি তো সেখানে যাবে না। কলকাতার গাড়ি পরেই আসবে ওই ওধারের প্ল্যাটফর্মে। ওভারব্রিজ দিয়ে যাবে, লাইন ডিঙিয়ে যেয়ো না যেন—বুঝলে?" বলে ভদ্রলোক মোট-ঘাট নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

"কই হে, তোমার টিকিট কই?"

কাঞ্চন দমবার ছেলে নয়, সহজভাবে উত্তর দিল—"আমি কি আপনার গাড়িতে চেপেছি নাকি? আমি তো বেড়াতে এসেছি।"

টিকিট চেকার বললেন—"স্টেশন হাওয়া খাবার জায়গা নয়।" এই বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন; কাঞ্চনও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন বেলা দুটোর বেশি। তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। সঙ্গে একটিও পয়সা নেই যে মুড়ি কিনে খায়। কী করবে ভাবতে ভাবতে চলেছে। কিছুদূর যেতেই দ্যাখে, একটা নাদুস-নুদুস ছাগল তাকে গুঁতোতে তাড়া করে আসছে। সে কিছুটা হটে রাস্তা থেকে পাটকেল কুড়িয়ে তাক করে তাকে মারতে যাবে, এমন সময়ে সামনের চালাঘর থেকে একটি ততোধিক মোটা মেয়েমানুষ শশব্যস্তে বের হয়ে আর্তকণ্ঠে বললে—"আহা, মেরোনি বাবা, মেরোনি। বাছা আমার মরে যাবেক।"

"মারছি না; কিন্তু বাছাকে সামলাও।"

ছাগলকে নিয়ে যেতেই তার নজর পড়ল সেই ঘরটির দোরের ওপর। একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে বিচিত্র ছাঁচে ও বিচিত্র বানানে লেখা—

পবীত্র হীন্দু-হোটেল—হীন্দু ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান

সে স্ত্রীলোকটিকে বললে—"এখনো কি তোমার হোটেলে খাবার-টাবার আছে?"

"খুব আছে, খাবে তুমি?"

"নিশ্চয়।"

কাঞ্চন খাওয়া-দাওয়া সেরে বললে—"কত দাম দিতে হবে?"

"এমন আর কী খাইছ, যা খুশি দাও।"

"তোমরা নাও কত?"

"চোদ্দ পইসা।"

"আমি তো তার অর্ধেকও খেতে পারিনি—অর্ধেক দেব।"

"তাই দাও।"

মশলা নিয়ে গম্ভীরভাবে চিবুতে চিবুতে কাঞ্চন বললে—"তোমার যা রান্না, আর আমি যা খেয়েছি, তাতে তোমাকে এক পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। আমি কিচ্ছুই দেব না।"

হোটেলওয়ালী হেসে বললে—"আচ্ছা না দিবেক, তো নাই দিবেক।" মোটা ছাগলটি এসে এবার আদর করে তার হাত চেটে দিল, বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল—"দূর ছাই! ভালো আপদ দেখছি।" তার পরে হাতটা ছাগলেরই লোমশ গায়ে মুছে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্টেশনে ফিরে দেখল, একটা গাড়ি ওধারের প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে। সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাতে উঠে বসল। পাশের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করল—"মশাই, এ-গাড়ি যাবে কোথায়?"

তিনি একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"কেন, কলকাতায়!"

কলকাতা তখন আর কয়েকটা স্টেশন পরেই। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ জমে উঠেছিল। কলকাতা কেমন জায়গা! সেখানে সে এই প্রথম যাচ্ছে কিনা! হ্যাঁ, মামার বাড়িই। মামা তাকে নিতে স্টেশনে আসবেন; কিন্তু যদি দৈবাৎ স্টেশনে না-আসতে পারেন? তা, তাতে কী হয়েছে, ভদ্রলোক না-হয় তাকে মামার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবেন। এইরকম নানান কথাবার্তা। ভদ্রলোকের মুখে শুনে শুনে কল্পনায় সে কলকাতার ছবি আঁকছিল। কলকাতায় দিনরাত নাকি এক সমান, রাত্রে চাঁদের আলো পথে পড়তে পায় না। এত আলো রাস্তায়। সব ইলেক্‌ট্রিক! রূপকথার রাজপুরীর মতো বড় বড় বাড়ি! আর কত লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, সেপাই-শান্ত্রী—কত কী!

আর দশ মিনিট পরেই তার কত স্বপ্নের—কত সাধের কলকাতা!

কিন্তু একটা ভয় ছিল। সেটা প্রকাশ করে বলতেই ভদ্রলোকটি বললেন—"তাড়াতাড়িতে টিকিট করতে পারোনি, তা আর কী হয়েছে? তুমি তো আর ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছ না, আমি আগে বেরিয়ে গিয়ে একটা টিকিট কিনে এনে দেব, সেইটা দেখালেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।"

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকল। গোলমাল—হৈ চৈ—কুলি চাই?—কত লোক! বিদ্যুতের আলোয় কাঞ্চন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রলোকটি তার হাতে ওভারকোট দিয়ে বললেন—"এইটা ধরো। আমি এক্ষুনি ফিরছি।"

তিনি চলে গেলেন। কাঞ্চন দেখলে—ওভারকোটের পকেটে সোনার ঘড়ি-চেন, কাগজ-পত্র, আরো কত কী!

দশমিনিট পরে তিনি ফিরে এসে টিকিটটা কাঞ্চনের হাতে দিলেন। টিকিটখানা নেড়েচেড়ে কাঞ্চন দেখলে, তাতে লেখা আছে—প্ল্যাটফর্ম টিকিট, চার পয়সা দাম। নিজের শূন্য পকেটে হাত পুরে দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে—"দেখুন—আমার কাছে খুচরো পয়সা তো নেই—"

"আহা থাক্! চার পয়সা আর দিতে হবে না। তোমার মামা কই? এসেছেন তিনি?"

"আসবেন নিশ্চয়। দেখি তাঁকে—"

"আমি তবে চললুম, কেমন?"

ভদ্রলোক নিজের পথে চলে গেলেন। কাঞ্চন টিকিটখানা গেটে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধে। চারিধারে যেন সমারোহ লেগে রয়েছে। সে শুধু নিষ্পলক নেত্রে চারিদিকে চেয়ে রইল। এ-ই স্বপ্নপুরী কলকাতা!

কাঞ্চন অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে স্টেশনের বিরাট কলেবর দেখল। কতগুলো প্ল্যাটফর্ম! একটাতে গাড়ি লাগে তো আরেকটাতে ছাড়ে। কত যাত্রী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে—আসছে! টিকিট-ঘরই-বা কত! ইউনিফর্ম-পরা একজন লোক, বোধহয় রেলের কর্মচারী, কাঞ্চন সাহস করে তাঁকে ডেকে জিগ্যেস করল—"মশায়, এখানে ক'টা স্টেশন?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে গেলেন—"ক'টা স্টেশন মানে?"

"এতগুলো গাড়ি কিনা, তাই জিগ্যেস করছি।"

"স্টেশন তো একটাই জানি।" বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

একটা স্টেশন—আর এতগুলো প্ল্যাটফর্ম! কাঞ্চন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ-ও একটা স্টেশন, তাদের গাঁয়ে—সে-ও একটা স্টেশন। কত তফাত! এই রকম একটা স্টেশন তাদের গাঁয়ে হয় না? সে যদি খুব—খুবই বড়লোক হয়, তাহলে এইরকম একটা স্টেশন সেখানে তৈরি করবে। এইরকম একটা স্টেশন করতে কত টাকা লাগে, কে জানে!

তারপর ধীরে ধীরে সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই তার স্থির নেই। অনেক লোক যেদিকে চলেছে, তারও গন্তব্য যেন সেইদিকে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে বিচিত্র যানবাহনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। কত রকমের গাড়ি, কত রঙের—কত ঢঙের! ঘোড়ার গাড়ি—ও আবার কী—কী—মানুষ-টানা গাড়িও আছে আবার! এতগুলোর মধ্যে কেবল গোরুর গাড়িই যেন তার চেনা-চেনা মনে হল।

গাঁয়ের স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে লোকে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে, এখানে কই গোরুর গাড়িতে কেউ চাপছে না তো! গাড়িগুলোর ছপ্পরও নেই—যেন কী রকম!

পাশে একজন ঝাঁকামুটে দাঁড়িয়ে ছিল, কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করল—"ওই যে মানুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ও কোন্ গাড়ি হ্যায়?"

"উও তো রিকশা হ্যায়। তুম্ কিরায়া করো গে?"

"কেয়া বোলতা?"

"ভাড়া লেওগে?"

"নেহি নেহি। এই রকম জিজ্ঞাসা করতা হ্যায়। আর ওই যে সব গাড়ি, ঘোড়া নেই—আপ্‌সে আপ্‌সে চল্‌তা, ও তো মোটরগাড়ি হ্যায়, নেহি?"

মুটে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"হাওয়া-গাড়ি।"

"ঠিক ঠিক, উস্‌কা কথা হাম্ মার কাছে শুনেছি।"

কিন্তু মুটের সঙ্গে সদালাপ আর বেশিদূর অগ্রসর হল না। কেননা মুটেটা এরপর তার দিকে এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে, কাঞ্চনের তা মোটেই পছন্দ হল না। সে মুটেটাকে পরিত্যাগ করল।

জনতার পিছনে পিছনে অবশেষে যে হাওড়া পুলের ওপর এসে উঠল। কোথা থেকে হু-হু করে বাতাস এসে চুলের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ করে বইতে লাগল। কাঞ্চন আপনাআপনি বলে উঠল—"আরে এ যে একটা নদী!"

তারই মতো যে-ছেলেটি পাশাপাশি যাচ্ছিল, সে বললে—"নদী কী খোকা! এ যে গঙ্গা, জানো না?"

গঙ্গা? কাঞ্চনের মনে হল, এই সেই গঙ্গা, যার কথা সে মা'র কাছে গল্পে শুনেছে। তবু সে ঠকবার ছেলে নয়, পাল্টে প্রশ্ন করল—"গঙ্গা কি নদী নয়? তুমি তো খুব জানো!"

তার বয়সী একটা ছেলে তাকে 'খোকা' বলে ডাকবে, এ তার বরদাস্ত হবার নয়। ভারি রাগ হল তার ছেলেটার ওপর। যদিও দু-একটা অত্যাবশ্যক প্রশ্ন করবার কাঞ্চনের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এইরকম একটা অসভ্য ছেলেকে—? নাহ্, কিছুতেই না।

অত্যাবশ্যক প্রশ্নের একটা হচ্ছে এই যে, বইয়ে সে পড়েছে, এই পুলটা নাকি জলে ভাসছে। সত্যিই কি তাই? যদি সত্যিই হয়, তাহলে কী করে সম্ভব? আর যখন ভাসছে, তখন ডুবতেও তো পারে? আর ডোবে যদি হঠাৎ, তখন এই লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া—এসবের কী দশা হবে?

কিন্তু অমন ছেলেকে জিগ্যেস করার চেয়ে—নাহ্, কাজ নেই। একটু যদি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে সে নিজেই পর্যবেক্ষণ করে নেবে; কিন্তু যা লোকের ঠেলা! ক্রমশ কেবল এগুতেই হচ্ছে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

আপ্‌সে আপ্‌সে চল্‌তা, ও তো মোটরগাড়ি হ্যায়, নেহি?

তিন

একটা স্টিমার এদিকে আসছিল। বাঁক ঘুরতেই তার ফোকাসের তীব্র আলোক এসে ব্রিজের গায়ে লাগল। কাঞ্চন বিস্মিত চোখে সেইদিকে তাকাতে তাকাতে সহসা আপন মনে বলে উঠল—"ওটা বোধহয় একটা জাহাজ!"

"জাহাজ কি খোকা, ও তো স্টিমার!"

আবার সেই ছেলেটি, আবার সেই 'খোকা'! কিন্তু কাঞ্চন এবার গুম হয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

ছেলেটি কাঞ্চনের হাত ধরে বললে—"জাহাজ দেখতে চাও? ওই দ্যাখো—সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও-সব বিলিতি জাহাজ—বিলেত থেকে আসে।"

ততক্ষণে ফোকাসের আলো সেইসব অতিকায় জাহাজগুলোর ওপর পড়েছে। কাঞ্চনের বিস্ময় আর ধরে না। এইসব জাহাজের কথা সে গল্পের বইয়ে পড়েছে। তাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে এইরকম একটা জাহাজে চেপে বিলেত গেছে নাকি!

বিস্ময়ের আতিশয্যে ছেলেটার মুঠোর মধ্যে যে তার হাত আছে, তা সে ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু পুল পেরুতেই তার হুঁশ হল। এক ঝটকায় সে হাত ছাড়িয়ে নিল—"যাও, আমি জাহাজ দেখতে চাই না। ও আমি অনেক দেখেছি।"

"দেখেছ, কিন্তু চাপোনি তো? আমি একদিন লুকিয়ে চেপেছিলাম। খালাসিরা দেখতে পেয়ে নামিয়ে দিলে।"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে বলল—"চাপিনি, কিন্তু চাপব একদিন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়াব বড় হয়ে।"

কাঞ্চনের কল্পনা যেন ছেলেটিকে স্পর্শ করল। তারও তো এমনি ইচ্ছা করে। সে-ও একদিন জাহাজ চেপে পৃথিবী ভ্রমণ করতে চায়—সেই 'আশিদিনে ভূ-প্রদক্ষিণ'-এর লোকটার মতো। আজ যেমন এই পথে দেখা হয়েছে, তেমনি কোনোদিন হয়তো কোনো জাহাজে কি কোনো বিদেশে ওদের আবার দেখা হবে।

ছেলেটি এবার কাঞ্চনকে ভালো করে দেখল, তারপরে জিগ্যেস করল—"তুমি কোথায় যাবে খোকা?"

"যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।" বলে রাগ করে কাঞ্চন অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াল। ছেলেটি কিছুই বুঝতে না-পেরে অবাক হয়ে একটু অপেক্ষা করে অবশেষে চলে গেল।

না, আর ছেলেটিকে ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় না। তখন কাঞ্চন আবার চলতে শুরু করল, কিন্তু ছেলেটা থাকলেই ভালো ছিল যেন। বেশ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যেত।

—যাকগে! ভারি অসভ্য কিন্তু! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না আদপেই। সে হল গিয়ে কাঞ্চন—তাদের পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সব ছেলেই তাকে সম্ভ্রম করে চলে, আর তাকেই বলে কিনা খোকা! খোকা তো যারা দুধ খায়, হামাগুড়ি দেয়। মন্টু, ন্যাপলা—ওরা খোকা।

তবু তার কাছে কলকাতার হালচালটা জানা যেত। যাকগে, সে নিজেই দু-দিনে জেনে নেবে! সেই-বা কম কিসে!

ও বাবা, এ কী! এ যে কেবলই দোকান! রাস্তার দু-ধারেই! ফলের, খাবারের, মনোহারি জিনিসের! কীরকম ইলেকট্রিক আলো দিয়েছে! এত দোকান—এত জিনিসপত্র—এত সব কেনে কে!

কাঞ্চন অবাক হয়ে দোকান দেখতে দেখতে পথ চলল। কোনো দোকানি হয়তো জিগ্যেস করল—"কী চাই খোকা?" সেখানে কাঞ্চন মুহূর্তমাত্র দাঁড়াল না। কেউ যদি জিগ্যেস করল—"কী নেবে বাবু?" কাঞ্চন তাকে অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নেবার যোগ্য কী কী জিনিস আছে একবার খতিয়ে দেখলে, তারপর গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল—"বাহ্, বেশ দোকান তো তোমার!"

অধিকাংশ দোকানদার তাকে গ্রাহ্যই করল না। না করুক। এই রকম দু-একটা ভারী দোকান তাদের গাঁয়ে করতে হবে। বিশেষত ঐ মনোহারি দোকানটার মতো!

হঠাৎ কাঞ্চন দেখে কী, ভিড়ের মধ্যে একজন গুণ্ডাগোছের লোক এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিচ্ছে। গুণ্ডাটা বিনা বাক্যব্যয়ে সরে পড়ছে দেখে কাঞ্চন ভদ্রলোককে গিয়ে বললে—"ও মশাই, ওই লোকটা আপনার পকেট থেকে কী নিয়ে পালাচ্ছে!"

"অ্যাঁ, তাই নাকি? তাই তো! ধর্, ধর্—চোর, চোর্!"

ভদ্রলোকের আর্তনাদে চারিধার সচকিত হয়ে উঠল—লোকটাও ধরা পড়ল। তারপর মার যা খেল লোকটা! অবশেষে পাহারাওয়ালা এসে পড়ল; লোকটার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল। কাঞ্চনের ভারি মায়া হতে লাগল। সে-ই তো ধরিয়ে দিলে!

ভদ্রলোক বললেন —"আমার একশ টাকা ছিল ব্যাগে—দেখি!" তারপরে নোট ও টাকা গুনে একগাল হেসে বললেন—"সব আছে, কিচ্ছু নিতে পারেনি।"

একজন বললে—"ওই ছেলেটির জন্যেই তো পেলেন। ওকে দিন কিছু!" আরো কয়েকজন তার কথায় সায় দিল। ভদ্রলোক তখন গম্ভীর হয়ে বললেন—"আপনারা যখন বলছেন তো দেওয়া উচিত বইকি।—এই ট্রাম, রোখো রোখো—" বলে চলন্ত গাড়িতে তিনি উঠে পড়লেন। যে লোকটি অনুরোধ করেছিল, সে বললে—"বেশ লোক কিন্তু! না-দিয়েই চলে গেল!" যে লোকটি সায় দিয়েছিল, সে শুধু বললে—"কলিকাল!" তারপর যে যার কাজে চলে গেল, কাঞ্চন আবার চলতে লাগল।

এক জায়গায় দেখে, নানারকম জিনিস স্তূপাকার, তার পাশে একটি প্যাকিং বাক্সে বসে তারই বয়সী একটি ছেলে বিচিত্র-সুরে ছড়া কাটছে—

নীলামওয়ালা এক আনা,
জার্‌মান্‌ওয়ালা এক আনা!
শস্তাওয়ালা এক আনা!
সুবিস্তাওয়ালা এক আনা!
লে-যাও বাবু, এক আনা!"

ওই ছেলেটি এইসব এত জিনিসের মালিক নাকি? কাঞ্চনের হিংসে হতে লাগল। আহ্, যদি কিছু পয়সা থাকত তার! সবরকম কিছু-কিছু কেনা যেত। এত শস্তায় এত রকমের জিনিস! তাদের গাঁয়ে হলে সবার তাক লেগে যেত।

মনে-মনে একআনার সিরিজের তারিফ করতে করতে কিছুদূর না-এগুতেই দেখে, আরো ক'জন লোক হাত নেড়ে সুর করে হাঁকছে—

ছুরি কাঁচি দু পইসা।
তালা-চাবি দু পইসা।
সাবান-ফিতা দু পইসা!
ঘড়ি-পেন্‌সিল দু পইসা।
রঙ্কম-রঙ্কম দু পইসা।
লে-যাও বাবু, দু পইসা!

কাঞ্চন একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না—এমন সব চমৎকার জিনিস দু পয়সায়! ওরই মধ্যে যেটা তার কাছে সবচেয়ে বহুমূল্য মনে হল, সেইটা দেখিয়ে পসারীকে জিগ্যেস করল—"ওর দাম কত?"

"দু পইসা। হরেক চিজ দু পইসা!"

কাঞ্চন ভাবতে লাগল, বাড়ি থেকে পালাবার সময় যদি বুদ্ধি করে কিছু পয়সাও সঙ্গে আনত! বাবা বলেন—'রাগের মাথায় কাজ করলে পরে পস্তাতে হয়।' কথাটা যে সত্যি, এতদিনে তা বোঝা গেল! রাগের মাথায় বাড়ি ছেড়েই তো সে পয়সা আনতে ভুলে গেছে! কত ভালো-ভালো জিনিস অত শস্তায় পাওয়া যাচ্ছে—এ কি আর বেশিক্ষণ পড়ে থাকবে? কাল কি আর পাওয়া যাবে? মন্টুর জন্যে একটা বাঁশি, ন্যাপলার জন্যে একটা রবারের বল, আর নিজের একটা ফ্যান্সি হাতঘড়ি—অন্তত এগুলো থাকলেও হয়।

ঘুরে ঘুরে সে সেই দ্রব্যসম্ভার পর্যবেক্ষণ করছে, এমন সময় কে যেন তার নড়া ধরে জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পাশ দিয়ে একটা মোটর হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা বলল—"আর একটু হলেই গেছলে যে! ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামে কখনো?"

কাঞ্চন এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝল, বলল—"আমায় চাপা দিত নাকি?"

"দিত-না আবার!"

"সে কী! গাড়িতেই তো মানুষ চাপে জানি, গাড়িও আবার মানুষ চাপে?"

"আক্‌ছার! রোজই তো দু-চারটে মোটরের তলায় মরছে। কলকাতার রাস্তায় খুব সাবধানে চলবে, ফুটপাথ ছাড়া চলবে না, আর রাস্তা পেরুবার সময় চারিদিক দেখবে। বুঝলে?"

কাঞ্চন মোচড়ানো হাতটার শুশ্রূষা করতে করতে ঘাড় নাড়ল।

"লেগেছে নাকি হাতে?"

"খু-উ-ব। আপনি যেমন করে টানলেন!"

"তোমার ভাগ্যি যে, বেঁচে গেছ। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!"

কাঞ্চন চুপ করে রইল। ভাবখানা এই যে, ধন্যবাদ সে কিছুর জন্যে কারুকেই দেয় না।

"তোমার বাড়ি কোথা?"

কাঞ্চন চুপ।

"বুঝতে পেরেছি, তুমি কলকাতার নও। কোথায় দেশ?"

কাঞ্চন উত্তর দেয় না।

"বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি? বাবা বোধহয় মেরেছিল? সত্যি করে বলো।"

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে।

"কেন?"

"রোজগার করতে।"

"এই বয়সে? কার জন্যে রোজগার?"

"মা'র জন্যে। আমার মা'র বড় দুঃখ।"

"তোমার কে আছে আর?"

"বাবা আছেন। দু'ভাই আছে। তারা ছোট।"

"বাবা আছেন! তবে তোমার মা'র দুঃখ কিসের?"

"বাবা মাকে একটাও পয়সা দেন না কিনা, তাই মা আমাদের কিছু কিনে দিতে পারেন না। তাই মা'র দুঃখ। আমি রোজগার করে মাকে টাকা দেব। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।"

চার

খানিক থেমে লোকটি বললে—"তা বেশ। তা তুমি কী কাজ পারো?"

"সব কাজ।"

"বটে? আমার দোকানে বসে বিক্রি করতে পারবে?"

"খুব। আপনার কিসের দোকান?"

"সন্দেশের দোকান।"

কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে—"নিশ্চয় পারব!"

তার উৎসাহে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে লোকটা বললে—"বলো কী! আমার সন্দেশ সব খেয়ে উড়িয়ে দেবে না তো?"

"না-না। কক্‌খনো না!"

"তুমি খাবে দাবে, তাছাড়া তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করে দেব। রাজি আছ? সকালে দু-পয়সা করে পাবে জলখাবার; কিন্তু আমার সন্দেশ তুমি খেতে পাবে না, ওর দাম অনেক, চার পয়সার নিচে নেই।"

কাঞ্চন ঈষৎ ম্লান হয়ে বললে—"তা হোক! আমি পারব; সন্দেশের কাছে বসে থাকলেও ভালো লাগে।"

দুজনে কলেজ স্ট্রিটের মোড় বরাবর এসেছে, এমন সময় অপরদিক দিয়ে মহাসমারোহে একটা বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছে। কাঞ্চন অত্যন্ত বিস্ময়ে লোকটিকে জিগ্যেস করল—"এত লোক আলো কাঁধে করে যাচ্ছে কেন?"

"কোনো বড়লোকের বিয়ে হচ্ছে, তারই প্রসেশান।"

"ওহ্! কী চমৎকার বাজনা—নাচতে ইচ্ছে করে!"

"নেচো-না যেন—তাহলে আবার মোটর-চাপা পড়বে!"

"ওটা কী বাজনা? কখনো শুনিনি তো!"

"ও হচ্ছে ব্যান্ড। কেল্লার গোরাদের বাজনা; দ্যাখো দ্যাখো—ওই চতুর্দোলায় বর আসছে। দেখছ, দিব্যি বরটি!"

কোনো উত্তর না-পেয়ে লোকটি ফিরে দেখে কাঞ্চন কাছে নেই, কোথায় গেল? পাশের একজন লোককে জিগ্যেস করল—"মশাই, এখানে একটি ছেলে ছিল, কোন ধারে গেল দেখেছেন?" সে-প্রশ্ন পাশের লোকটির কানেও গেল না।

কাঞ্চন তখন লোক-লস্কর, ব্যান্ড, ব্যাগ্‌পাইপ, চতুর্দোলার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—সন্দেশের দোকানের কথা তার মনেই নেই।

পাঁচ

শোভাযাত্রা যেখানে গিয়ে শেষ হল, সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। লাল, নীল, সবুজ নানারকমের আলোকমালায় তাকে সাজানো হয়েছে; বাড়িখানিকে কাঞ্চনের আলাদিনের মায়াপুরী বলে মনে হতে লাগল। এর ভেতরে না-জানি কী রহস্যই আছে!

বর অনেকক্ষণ বাড়ির মধ্যে চলে গেছে। অনেক লোক—তাদের অধিকাংশই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, ভেতরে যাচ্ছিলেন। কাঞ্চন ভাবতে লাগল, সে-ও যাবে কি

না। অনেক ছোট-ছোট ছেলেমেয়েও তো যাওয়া-আসা করছে। কাঞ্চন একবার নিজের বেশভূষার দিকে তাকাল—তুলনা করে দেখল—তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকের সঙ্গে এ যেন ঠিক খাপ খায় না।

কাঞ্চন মনে-মনে ইতস্তত করতে লাগল; কিন্তু অবশেষে যখন ভেতর থেকে লুচিভাজার চমৎকার গন্ধ তার নাকে এসে লাগল, তখন আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সে সমীচীন মনে করল না। ভিড়ের মধ্যে মিশে, তাদেরই একজন হয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে একেবারে ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হল।

ভেতরে গিয়ে দেখে—এক বৃহৎ আসর। নানা আকারের নানাবিধ ভদ্রলোক সেই আসরে শোভা পাচ্ছেন। কতকগুলি লোক অত্যন্ত তটস্থভাবে তাদের আদর-আপ্যায়ন করছে। সে-জায়গাটা তার আদপেই ভালো লাগল না। সেখান থেকে সরে আসরের আর-এক প্রান্তে গেল, সেখানে তখন গান-বাজনার চক্রান্ত চলছে। কৌতূহলের বশে সে-ও সেখানে গিয়ে বসল।

খানিক বাদেই গান শুরু হল। খানিকক্ষণ শুনে আর কাঞ্চনের সহ্য হল না, সে উঠে দাঁড়াল। পাশের একজন ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন—"কী খোকা, উঠলে কেন? বসো, বসো।"

কাঞ্চন তাঁকে জিগ্যেস করল—"মশাই, লোকটা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন—"চেঁচাচ্ছে! চমৎকার গাইছে! ও হচ্ছে ধ্রুপদ, সবাই গাইতে পারে না। উনিই ভুতোবাবু, নমস্য ব্যক্তি।"

কাঞ্চন বললে—"হোকগে—ভুতোবাবু। ও কি গান! ও যে মারামারি কাণ্ড!"

কাঞ্চন সেখান থেকে উঠে গেল।

"যেন জ্যাঠামশাই!" কাঞ্চনের উদ্দেশে এই মন্তব্য করে ভদ্রলোক আবার 'ভৌতিক' গানে মনোনিবেশ করলেন।

কাঞ্চন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে যেখানে বিয়ে হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। বর-কনে পাশাপাশি বসে আছে, তাদের সম্মুখে আগুন জ্বলছে এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ চলছে। আগুনের দীপ্তিতে চন্দনচর্চিত কনের আনত মুখখানি কাঞ্চনের ভারি ভালো লাগল। সে দরজার পাশে একধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে প্রায় তারই সমবয়সী সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত বিবাহ-ব্যাপারটাই তার হঠাৎ ভারি ভালো লেগে গেল।

এর আগে যদি কেউ তাকে ঠাট্টার ছলেও বলেছে—"তুই বিয়ে করবি?" তখন সে তাকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, বরং তার চেয়ে কেউ তাকে প্রাণ দিতে বললে তাতে সে তৎক্ষণাৎ রাজি ছিল। আজ কিন্তু তার মনে হল, মরার তুলনায় বিয়ে করাটা নিতান্ত খারাপ নয়, বরং বিয়ে করাতে বেশ মজা আছে।

ছেলেবেলায় রাম-সীতার ছবি দেখে সে নাকি মাকে বলেছিল—"মা, আমার সীতার মতো বউ চাই।" মা প্রতিবেশিনীদের কাছে তার এই দুর্বলতার কাহিনী প্রকাশ

করে আজও কৌতুক করেন। এজন্যে মা'র ওপর তার এক-এক সময়ে রাগ হয়।

সে নাকি বলেছিল—"আমি রামের মতো রাজা হয়ে বসব, সীতার মতো বউ আমার পাশে বসবে, মন্টু আমার মাথায় ছাতা ধরবে, ন্যাপলা হনুমানের মতো হাতজোড় করে থাকবে!"

মা বলেছিলেন—"কিন্তু ন্যাপলার যে ল্যাজ নেই!"

সে জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—"ল্যাজ হবে! ল্যাজ হবে, মা। তুমি দেখো, বড় হলে ওর ল্যাজ হবে!"

তার ছোটবেলার এই গবেষণা নিয়ে প্রায়ই হাসাহাসি হয়। এই ল্যাজ হবার কথা ভাবলে তার নিজেরও আজ হাসি পায়, যদিও সে হাসে না। ন্যাপলার ল্যাজ না-হয় না-ই বেরুল, মন্টু যদি ছাতা ধরার চেয়ে ঘুড়ি ওড়ানোটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করে তাতেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু সীতার মতো বউ পাবার বাসনাটা তার মনে বহুদিন পরে হঠাৎ জেগে উঠল। একটা বউ না-পেলে আর চলছে না। অন্তত সীতা যদি এ-যুগে সুলভ না-ও হয়, এই মেয়েটির মতো একটি হলেও তার চলবে।

কাঞ্চনের মন যেন উদাস হয়ে গেল। উদাস হবার আর একটা কারণ, সেই লুচিভাজার গন্ধটা বিয়ের ঘর পর্যন্ত হানা দিয়েছিল। অবশ্য সেটা গৌণ কারণ, কিন্তু ক্রমশ সেইটাই মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল! যে-ঘরে এই বিবাহোৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেই ঘরটি বের করবার জন্যে কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কাঞ্চন এখন কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করতে চায়—কিন্তু আমেরিকা নয়, সীতাও নয়—সেই লুচিভাজার ঘরটা।

কিন্তু সেই ঘরটি বোধহয় অন্দরমহলে। অনেক চেষ্টা করেও কাঞ্চন সেখানে যাবার পথ খুঁজে পেল না। বাড়িটা যেন গোলকধাঁধার মতো! অবশেষে বিরক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে সে রাস্তার যানবাহনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল; কিন্তু তা-ও বেশিক্ষণ ভালো লাগল না। অতঃপর সে ব্যান্ডওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। তাদের বাঁশির বহর আগেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেগুলোর অদ্ভুত আকার-প্রকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানবার তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যান্ডওয়ালারা এতই গম্ভীর প্রকৃতির যে, তাদের সঙ্গে কাঞ্চনের ভাব জমল না।

অগত্যা সে আবার বাড়ির ভেতর গেল। যেখানে বিবাহপর্ব চলছিল সেই ঘরটির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল—সে-অঞ্চলে এবার একটি নতুন মেয়ের আবির্ভাব হয়েছে। মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে দু-এক বছরের ছোট হলেও অতবড় মেয়েকে কেবল ফ্রক পরে বেড়াতে এর আগে কখনো দ্যাখেনি। সেই মেয়েটি একটি ছোট্ট ছেলেকে হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে কী বোঝাচ্ছিল, তার ছোট্ট বেণিটি দুলছিল। সেই মেয়েটি, তার কথাবলার ভঙ্গি, তার মাথা-নাড়া, তার বেণির দোলন—তার সমস্তই কাঞ্চন অবাক হয়ে দেখছিল।

তার বড় কৌতূহল মেয়েটির সম্বন্ধে। খানিক বাদে সেই ছেলেটি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"ঐ মেয়েটি কে ভাই?"

ছেলেটি একমুহূর্ত তার দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল। তারপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে জিগ্যেস করলে—"হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?"

কাঞ্চন একটু ধাক্কা খেল, কিন্তু দমল না। সে কি ইংরিজি জানে না? সে-ও ইংরিজিতে জবাব দিল—"মাই নেম ইজ কাঞ্চন।"

ছেলেটি আবার জিগ্যেস করল—"হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন?"

কাঞ্চনের কেমন ধারণা ছিল যে, তার বয়সের অনুপাতে সে নিচু ক্লাসে পড়ে, সেইজন্য ক্লাসের পরিচয় দিতে তার স্বভাবতই অনিচ্ছা হল। সে শুধু বললে—"আই ডোন্ট সে!"

"ইউ মাস্ট সে!"

"নেভার!"

দূর থেকে তাদের এই বিজাতীয় তর্কাতর্কি শুনে এবার সেই মেয়েটি এগিয়ে এল! ছেলেটিকে জিগ্যেস করল—"কী হয়েছে রে ভোম্বল?"

মেয়েটির সামনে কাঞ্চনের বুক টিপটিপ করতে লাগল। এরকম তার কখনো করে না, এমনকি দুর্ধর্ষ মাস্টারমশায়ের সামনেও না। কাঞ্চনের মনে হল এরকম বিপদে সে কখনো পড়েনি।

ভোম্বল বললে—"মিনি-দি, দ্যাখ্ না এই ছেলেটা। আমি জিগ্যেস করছি, কোন ক্লাসে পড়ো? যেন মারতে আসছে! বলছে—আই ডোন্ট সে—কিছুতেই বলবে না।"

মিনি-দি বললে—"আচ্ছা, আমি পরীক্ষা করছি, দাঁড়া! এই বানান কর্ দেখি মেনটেন। ভোম্বল, জানিস, এটা ভারি শক্ত বানান, ছোড়দা আমায় ঠকিয়েছিল।"

মেনটেন! হুঁঃ! ভারি শক্ত! কাঞ্চনের কাছে এ-বানান অতি তুচ্ছ! ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, থাইসিস কিংবা আরকিপিলেগো হলে বরং কথা ছিল। নাহ্, মেয়েটির কাছে তার বিদ্যার পরিচয় একটু দিতে হল।

"মেনটেন? এম্-ই-এন্-টি-ই-এন—মেনটেন।"

মুখ টিপে মিনি জিগ্যেস করল—"মানে?"

"মানে? দশজন মানুষ।"

এবার মিনি হেসে ফেলল—"তোমার মাথা!"

কাঞ্চন বললে—"আহা, দশজন মানুষ না হয়ে হল গিয়ে মানুষ দশজন—মেনটেন; ও একই কথা।"

মিনি বললে—"তোমার মুণ্ডু! মেনটেন হচ্ছে এম্-এ-আই-এন্-টি-এ-আই-এন। এর মানে প্রতিপালন করা। এ-ও জানো না তুমি।"

বানান কর্ দেখি মেনটেন

এবার কাঞ্চন মরিয়া হয়ে উঠল। তাকে অপদস্থ করার জন্যে মেয়েটার ওপর ভারি রাগ হল। সে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা তুমি বানান করো দেখি—শূর্পনখা?"

মেয়েটি একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলে। "শূর্পনখা? ভোম্বল, কী 'স' জানিস? দন্ত্য 'স', না মূর্ধণ্য 'ষ'?" ভোম্বল ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

"কী 'উ'? হ্রস্ব 'উ' না দীর্ঘ 'ঊ'?" ভোম্বল আবার ঘাড় নাড়ল।

মেয়েটি কাঞ্চনকে বললে—"বলছি দাঁড়াও। দন্ত্য স-য়ে হ্রস্ব উ, প-য়ে রেফ সুর্প, ন আর খ-য়ে আকার—সুর্পনখা।"

কাঞ্চন বললে—"তোমার মাথা! নিজের নামের বানান জানো না, আবার এসেছ পরীক্ষা করতে!"

এবার মেয়েটি রেগে গেল। "কী, আমার নাম শূর্পনখা? তুমি তবে ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচের বানান জানো তো?"

ভোম্বলের এবার ভারি ফূর্তি! সে 'ঘটোৎকচ' বলে হাততালি দিতে লাগল।

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে বলল—"ঘটোৎকচ হতে পারি, কিন্তু সিংহের মামা তো নই! সিংহের মামা তো একটা জানোয়ার।"

মিনি বললে—"সিংহের মামা আবার কে?"

"কেন, এই যে তোমার পাশে, ভোম্বলদাস।"

এ-কথায় মিনিকে হাসতে দেখে ভোম্বল অত্যন্ত মুষড়ে গেল। সে বলল—"আমার নাম বুঝি ভোম্বল? আমার নাম তো সুপ্রকাশ। ছোড়দা, ও ছোড়দা!"

একটি বছর-কুড়ি-বাইশের ছেলে ওধার দিয়ে যাচ্ছিল। সে দূর থেকেই জবাব দিল—"দাঁড়া, দাদার বিয়েটা কতদূর দেখে আসি।"

ভোম্বল হেঁকে বলল—"দ্যাখো না ছোড়দা, এই ছেলেটা আমাদের অপমান করছে!"

ছয়

অপমানের কথা শুনে ছোড়দা এগিয়ে এল। মিনিকে ডেকে জিগ্যেস করল—"তোরা কী করছিস এর সঙ্গে?"

ভোম্বল জবাব দিলে—"মিনিদি শুধু ওকে বলেছে—'মেনটেন বানান কর্ দেখি', তা ও যা বলছে! তুমি ওকে একবার এগজামিন করো না, ছোড়দা!"

অপরকে পরীক্ষিত হতে দেখলে ভোম্বলের ভারি আমোদ হয়। তা ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এগজামিন করায় ছোড়দার কীরকম আগ্রহ তা সে জানে।

ছোড়দা বললে—"বটে? তোমার নাম কী বাপু?"

কাঞ্চন অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিল—"কাঞ্চন।"

"কাঞ্চনের ইংরিজি কী?"

কাঞ্চন গুম হয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

"কাঞ্চনের ইংরিজি হচ্ছে গোল্ড্, তা-ও জানো না? সাহসীর ইংরিজি বোল্ড্। ঠাণ্ডার ইংরিজি—কোল্ড্। বলিয়াছিল-র ইংরিজি—টোল্ড্। পুরাতনের ইংরিজি—ওল্ড্! তৈরি করার ইংরিজি—মোল্ড্। বিক্রীত-র ইংরিজি—সোল্ড্। ধরে থাকার ইংরিজি—হোল্ড্। নাহ্, তুমি কিচ্ছু জানো না!"

কাঞ্চন নীরব।

"আচ্ছা, ট্রান্সলেট করো তো—'আমার একটা গাধা ছিল।' লজ্জা কী? বলে ফ্যালো!"

কাঞ্চন তবু কিছু বলে না।

"ভয় কিসের? বলে ফ্যালো। ভয় নেই।"

এবার কাঞ্চনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। ভয়? অমন যে অঙ্কের মাস্টারমশাই, অমন যে সেকেন্ড পণ্ডিতমশাই, তাকেই সে ভয় করে না, আর সে ভয় করবে এই—হুঁঃ!

কাঞ্চন গর্বের সঙ্গে বলল—"ভারি তো ট্রান্সলেশন! 'আই ওয়াজ এ অ্যাস'।"

ছোড়দা ভারি হাসতে লাগল। কাঞ্চন সংশোধন করে বললে—"আই ওয়াজ অ্যান অ্যাস।"

ছোড়দা তবুও হাসে। কাঞ্চন অপ্রতিভ হয়ে বলল—"কেন, ভুলটা হল কোথায়? পাস্ট টেন্স্ তো দিয়েছি।"

ছোড়দা শুধু বলল—"ওরে, তোরা কেউ এই গাধাটাকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে আয়।" বলে মিনি ও ভোম্বলকে নিয়ে চলে গেল।

ভোম্বল যেতে যেতে বলল—"ও কিন্তু, ছোড়দা, মিনিদির কথা জিগ্যেস করছিল। বলছিল—'ও মেয়েটা কে?' তাতেই তো আমার রাগ হয়ে গেল।"

ছোড়দা বলল—"তাই নাকি? মিনির কথা জিগ্যেস করছিল? তবে বোধহয় মিনিকে আমাদের ওর পছন্দ হয়েছে।"

মিনি শুধু বলল—"দূর।"

ছোড়দা বলল—"তা মন্দ কী! মিনি, ওকে যদি তোর বাহন করিস, তাহলে তুই শীতলা ঠাকরুণ হবি।"

মিনি দাদার পিঠে কিল বসিয়ে দিল।

এদিকে কাঞ্চন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে এককোণে বসে রইল। এত উৎসব, আনন্দ, কর্ম-কোলাহল—কিছুই তার আর ভালো লাগছিল না। মেয়েটির সামনে! ছি ছি! নাহ্, ইংরিজিটা তাকে ভালো করে শিখতেই হবে। হয়তো দু-পাঁচ বছর বাদে ওই ছোড়দা আবার তার সঙ্গে লাগতে আসবে, কিন্তু তখন সে হেডমাস্টারের মতো ইংরিজি জানে; তখন তার কাছে বিদ্যে ফলানো সোজা নয়! তখন সে তাকে আচ্ছা জব্দ করে দেবে—ওই মিনির সামনেই। হ্যাঁ!

বেশিক্ষণ কিন্তু মুখ চুন করে থাকবার ছেলে সে নয়। যেমনি ঘোষণা হল যে বামুনদের পাতা পড়েছে, তৎক্ষণাৎ সে অদম্য উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার তার মনে হল, সে তো বামুন নয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মন জবাব দিল—'না হোক্‌গে, খাওয়াটাই আসল, বামুনটা নয়।'

সে সটান বামুনের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসে পড়ল। নানারকম তরিতরকারি পাতে পড়তে লাগল। কাঞ্চন এক-একটু চেখে দেখল। তার পরে লুচি এল। ময়দার ছোট ছোট ফুলকো লুচি—গুটি ছয়। সে ছ'খানা তো কাঞ্চনের এক নিশ্বাসে উড়ে গেল। তারপরে আবার প্রত্যেকের পাতে চারখানা করে পড়ল—কাঞ্চনের দ্বিতীয় গ্রাস। তৃতীয় বারে জনপ্রতি জিগ্যেস করে লুচি দিচ্ছিল। অনেকেই বলল—"আর না।" কাঞ্চন চুপ করে রইল, ফলে তার পাতে আর দু'খানা পড়ল। সে দু'খানা মরুভূমিতে জলবিন্দুর মতো তৎক্ষণাৎ শুষে গেল। তারপরেই দই-সন্দেশ এল। তারপর আর লুচি এল না।

কাঞ্চন মনে-মনে বলল—"ধুত্তোর এই কি না কলকাতার ভোজ!" পাশের একজন ভদ্রলোক যখন বললেন—"নাহ্ খাওয়াটা আজ বেজায় হয়ে গেল, অম্বল না-হলে বাঁচি, একটা সোডা খেতে হবে,..." তখন কাঞ্চন তার ওপর দস্তুরমতো রেগে গেল। ঐ নামমাত্র আহার যেন ঘৃতাহুতি, কাঞ্চনের জঠরানল তার ফলে দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে।

কী করে বেচারা! সকলের সঙ্গে উঠে তাকেও আঁচাতে হল। অবশেষে আবার ঘোষণা হল, "কায়স্থদের জায়গা হয়েছে।" তখন কাঞ্চনের আত্মাপুরুষ বলে উঠল—"আমি তো কায়স্থ! এবার আমার ন্যায্য অধিকার, আমার বার্থ-রাইট!" কাঞ্চন কায়স্থদের দলে গিয়ে দ্বিতীয়বার খেতে বসে গেল।

কাঞ্চন যখন দ্বিতীয়বার আঁচাচ্ছে, ভোম্বল তখন মিনির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—"দেখছিস, ছেলেটা কী পেটুক ভাই! একবার বামুনদের সঙ্গে খেয়ে আবার কায়স্থদের দলে—"

মিনি তাকে থামিয়ে দিল—"যাহ্, বকিস নে।"

"কেন? আমি দেখেছি যে—"

"ওর শরীরখানা দেখেছিস? কী রকম মাস্‌কিউলার? তোর মতো পটকা নাকি? তোর মতো তিনটেকে পিষে ফেলবে। তোর তিনগুণ না-খেলে ওর চলবে কেন? কীরকম চওড়া বুক দেখেছিস?"

কথাটা কাঞ্চনের কানে গেল। শরীরের প্রশংসায় তার চওড়া বুক যেন আরো চওড়া হয়ে উঠল। নিরুৎসাহিত ভোম্বলের মলিন মুখের দিকে বিজয়গর্বে সে একবার কটাক্ষপাত করল, তারপর কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে গম্ভীর মুখে পাশ দিয়ে চলে গেল—যেন স্বয়ং গামা কি গোবর।

তার কানে গেল ভোম্বলের প্রতিবাদ। সে বলছে—"হ্যাঁ, ভা-রি তো বুক! অমন ঢের দেখেছি। ওকে এমন বক্সিং-এর প্যাঁচ মারব যে, বাছাধন—" বলে বক্সিং-এর একটা প্যাঁচ মিনিকে সে দেখিয়ে দিলে।

মিনি উত্তর দিল—"যাহ্ যাহ্, তোকে আর বাজে বড়াই করতে হবে না। তুই তো তুই! ছোড়দাও ওর সঙ্গে পারবে কি না—"

বাকি কথাটা কাঞ্চন শুনতে পেল না। তার আর শোনার দরকারও ছিল না। বিদ্যায় না-হোক, অন্তত গায়ের জোরে সে যে ছোড়দার সমকক্ষ, একথা ভাবতে তার ভারি আরাম বোধ হল। আর এই ধারণা হচ্ছে মিনির—সেই মেয়েটি—যাকে বিয়েবাড়ির সমস্ত মেয়ের মধ্যে তার পছন্দ হয়েছে।

যে-ঘরে গানের আসর বসেছিল, সেখানে তখনো তুমুল উদ্যমে গীত-বাদ্য চলছে। হাত, পা ও গলার একটানা কসরতে ভুতোবাবু তখনো কাহিল হননি। কাঞ্চন মনে-মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বড় দেয়াল-ঘড়িতে দেখলে—বারোটা বেজেছে। ঘড়ির অনুশাসনকে উপেক্ষা করা অনুচিত বলে তার মনে হল। তৎক্ষণাৎ সে সেই বিস্তীর্ণ আসরের একপ্রান্তে লম্বা হয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে সে আজ সমস্ত দিনের কথা ভাবতে লাগল। আজ বেলা দুপুরে সে বাড়িতে ছিল, আজ রাতদুপুরে সে এখন কোথায়! সে যে কোথায়, কার বাড়িতে সে নিজেই জানে না। সমস্ত দিনে কত কাণ্ডই-না ঘটল! কিন্তু দৈহিক শক্তি কিছু-বা থাকলেও চিন্তাশক্তি কাঞ্চনের আদপেই ছিল না। খানিকবাদেই সে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের মহামারী আস্ফালনকে উপেক্ষা করে ও সমস্ত দুর্ভাবনা ভুলে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—সে সত্যিই রাজা হয়েছে। তবে অযোধ্যার নয়, কলকাতার। সোনার সিংহাসনে সে বসেছে। মন্টু ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, লাট্টু-ঘোরানো ইত্যাদি যাবতীয় জরুরি কাজ পরিত্যাগ করে তার মাথায় ছাতা ধরেছে; আর ন্যাপলা—ওমা! তাই তো! সত্যিই যে ওর ল্যাজ গজিয়েছে! সে বেচারা যথাসাধ্য গাল ফুলিয়ে তটস্থ হয়ে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে যে বসেছে, কাঞ্চন ভালো করে ঠাহর করে দেখলে, সে মিনি ছাড়া আর কেউ নয়! কাঞ্চনের ভারি আনন্দ হল।

কিন্তু কথায় বলে—অত সুখ সয় না! কোথা থেকে সেখানে তার বাবা এসে হাজির। তাঁর হাতে সেই রুপো-বাঁধানো ছড়ি—মালখানা থেকে সদ্য-বহিষ্কৃত। নাহ্, আর রাজত্ব করা নিরাপদ নয়; একলাফে সিংহাসন, মিনি, মন্টু, ন্যাপলা—সবাইকে ত্যাগ করে কাঞ্চন দে ছুট। ছুট—ছুট—একছুটে একেবারে নিরুদ্দেশ।

কাঞ্চনের যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে।

বিস্তৃত ফরাশ তখন প্রায় জনশূন্য। একজন বুড়োলোক—সেই বাড়িরই কোনো কর্মচারী—এককোণে বসে একটা মোটা জাবদা খাতা নিয়ে বোধকরি হিসেবপত্র

দেখছিলেন, কাঞ্চনকে জাগতে দেখে কাছে ডেকে জিগ্যেস করলেন—"কাদের বাড়ির তুমি?"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—"আমাদের বাড়ির।"

লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—"তাতে কী বুঝব? যাই হোক, তুমি কি বাড়ি চিনে যেতে পারবে? তোমার লোকজন বোধহয় ভুলে তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন। ঠিকানা বললে তাঁদের খবর দিতে পারতুম।"

কাঞ্চন বললে—"কোনো দরকার পড়ে না। আমাকে কি আপনি পাড়াগেঁয়ে ভেবেছেন। কলকাতাতেই এতবড় হলুম, আর কলকাতার পথ-ঘাট চিনিনে! আমি ঠিক যাব।"

কাঞ্চন চলে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডেকে বললেন—"ওহে ছোকরা, তোমার চাদরটা ভুলে যাচ্ছ যে!"

কাঞ্চন দেখলে সে যেখানে শুয়ে ছিল, তারই কাছে একটি চমৎকার সিল্কের চাদর পড়ে আছে। কোনো ভদ্রলোক হয়তো কাল ফেলে গেছেন। কাঞ্চন বললে—"না, ও চাদর আমার নয়।"

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন—"তোমার নয়? ভালো! আমিও তাই ভাবছিলুম। তবে ওটা আমারই দাঁড়াল।"

কাঞ্চন ততক্ষণে বের হয়ে গেছে।

সাত

বাড়ির বাইরে সদর-দরজার ধারেই এঁটো পাতা, গেলাশ, খুরিতে স্তূপাকার। সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাশে মানুষ ও কুকুরের কোলাহল বেধে গেছে। চার-পাঁচজন ভিখিরি আবর্জনা ঘেঁটে তার ভেতর থেকে ছেঁড়া লুচি, ভাঙা সন্দেশ, ভাজা পাঁপরের টুকরো, ডাল-তরকারির অংশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সঞ্চয় করছিল, কুকুরদের তাতে প্রবল আপত্তি। তারা এতক্ষণ দূর থেকে সমবেত প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনে কোনো ফল না-হওয়ায় অবশেষে আক্রমণের উদ্যোগে ছিল, সেই সময়ে ভিখিরিদের একজন কুকুরদের অগ্রগামী নেতাটিকে এক লাঠি বসিয়ে দিয়েছে। তার ফলেই কোলাহল।

কাঞ্চন আহত কুকুরের পক্ষ নিয়ে বললে—"কাহে মার্‌তা ইস্‌কো?"

যাকে সাধুভাষায় বলে রোষকষায়িত নেত্র, ঠিক সেই চোখে ভিখিরিরা কাঞ্চনের দিকে একবার কটাক্ষপাত করল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, কাঞ্চনের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে, সে-ই সংক্ষেপে উত্তর দিল—"খানে আতা হ্যায়!"

কাঞ্চন বলল, "খায়েগা নেহি? কুকুরকা বাস্তে তো ফেক দিয়া।"

এইবার তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, সে কথা বলল—"আদ্‌মিকো খানে নেহি মিল্‌তা, কুত্তা খায়েগা?"

কাঞ্চন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল—"তুম্‌লোক এ লেকে কেয়া করেগা?"

সেই ছোট ছেলেটি বললে—"খায়েগা।"

কাঞ্চন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল—এত বড় শহর, এখানে এত বড়লোক, লোকের এত টাকা, এমন ভোজ, এমন শোভাযাত্রা, আর এখানেই কিনা মানুষকে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেতে হয়! কাকে দয়া করবে—কার পক্ষে সে দাঁড়াবে? কুকুরের, না মানুষের?

সেই দৃশ্যের সম্মুখে সে আর একটুক্ষণও দাঁড়াতে পারল না। কাল রাত্রের সমস্ত খাওয়া যেন তার গলা দিয়ে ঠেলে আসতে লাগল। সেইসঙ্গে কান্নাও। সে ভাবতে ভাবতে চলল—কুকুরের মুখের গ্রাস কেড়ে এখানে মানুষকে বাঁচতে হয়! এ কেন—এরকমটা কেন?

কেন যে এরকমটা, সে কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারল না। শেষে এই স্থির করল—সে বড় হলে কলকাতার সমস্ত ভিখিরিদের একটা বড়রকমের ভোজ দেবে। বড় হলে বড়লোক সে হবে নিশ্চয়ই, কেননা বড়লোক হতে দেরি হয় না, বড় হতেই যা দেরি। ভিখিরিদের কী কী খাওয়াবে, তারও একটা ফর্দ সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল।

আহ্, কালকে রাতের সেই ভোজটা। কম খাওয়াক, কিন্তু কী চমৎকারই খাইয়েছে! অত সাদা লুচি তাদের পাড়াগাঁয়ে হয় না। আর ক্ষীরটাই-বা কীরকম—ক্ষীরের মধ্যে কেবল দুধের সর, সমস্তটার স্বাদই আলাদা! দইটাই-বা কেমন মিষ্টি—তাদের গাঁয়ের দইয়ের মতো অমন সোঁদা টক নয়—ওরকম দই সে অনায়াসে একহাঁড়ি মেরে দিতে পারে। আর সন্দেশ! তাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলির দোকানের মণ্ডা—তা দিয়ে আম পাড়া যায়! দেবী গাঙ্গুলি সাতজন্মেও অমন সন্দেশ করতে পারবে না। আহ্, কী তার সোয়াদ—এখনো যেন জিভে লেগে আছে। হবেই তো। ওর দাম যে অনেক—কোনোটাই চার পয়সার নিচে নয়—বোধহয় আরো বেশি!

ভোজের কথা থেকে তার মিনির কথা মনে পড়ল। তার সঙ্গে দেখা করে এলে হত আজ। এখন ফিরে যাবে নাকি? সেই বুড়ো সরকারকে গিয়ে বলবে—'তোমাদের মিনিকে একবার ডেকে দাও না?'

কিন্তু যা মেয়ে বাবা! এখুনি এসে হয়তো জিগ্যেস করবে—'ফিলাডেল্‌ফিয়া কোথায়? স্যান্ডোমিঙ্গো কোথায়? কোথায় মিসিসিপি?' কিংবা হয়তো বলবে—'হিপোপটেমাস বানান করো।' তাহলেই তো সে গেছে। মেয়েটির সব ভালো, কেবল ওই একটা বড় দোষ!

নাহ্, এখন মিনির সঙ্গে দেখা করাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এখন মিনি কিছুতেই তাকে 'রেসপেক্ট' করবে না। নাহ্, সে বড় হয়ে এবং মিনির চেয়ে অনেক বেশি বিদ্বান হয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। মোটরে চেপে যাবে সে, গায়ে থাকবে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রিস্টওয়াচ, বুকপকেটে ফাউন্টেন পেন। মিনি তাকে চিনতেই পারবে না। তখন সে বলবে—'তোমার বড়দার বিয়ের রাত্রে আমাকে দেখেছিলে।' তখনও যদি চিনতে না পারে, তাহলে সেই লজ্জার কথাটা বলতে হবে—'তুমি যাকে মেনটেন বানান করতে বলেছিলে গো!' তখন মিনি নিশ্চয়ই চিনবে। সে মিনিকে বলবে—'এখন আমাকে বানান জিগ্যেস করতে চাও? আমি এখন এম.এ. পড়ি। অনেক মোটা-মোটা শক্ত-শক্ত বই আমাকে পড়তে হয়। তার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত খবর, সব বিদ্যা আছে। তুমি কী জানতে চাও বলো!' মিনি তখন লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকবে। আর তার ছোড়দা? সে তখন সাতবার বি.এ. ফেল করে বাড়িতে বসে আছে। আর ভোম্বল? সে তার দাদার দশা দেখে কলেজে ভর্তিই হয়নি।

একটা খবর-কাগজের হকার হেঁকে যাচ্ছিল—"মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—'১৯২১ সালের মধ্যেই স্বরাজ দিব'।"

কাঞ্চন ভাবল—স্বরাজ আবার কী? মহাত্মা গান্ধীই-বা কে? ডেকে জিগ্যেস করবে? ততক্ষণে হকার অনেকদূর চলে গেছে। স্বরাজ কি একটা বড়রকমের ভোজ-টোজ নাকি? মহাত্মা গান্ধী তাই বুঝি দেবেন? যদি মাসখানেকের মধ্যে পাকে, তাহলে ভোজটা সে খেয়েই বাড়ি ফিরতে পারবে। হকারের কাছে চেয়ে কাগজখানা দেখলে হত, ওতে বোধ হয় সব লেখা আছে।

খানিকদূর গিয়ে কাঞ্চন দেখে—বাহ্, একটা পুকুর যে! পুকুরের চারধারে রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আবার বেঞ্চি পাতা—সমস্ত জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাঞ্চন পুকুর দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল। এতক্ষণ কেবল বাড়িঘর দেখতে দেখতে চোখ যেন ক্ষয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে অনেকখানি কালো জল দেখে চোখ দুটো যেন জুড়োল, সে পুকুরের ধারে সিঁড়ির রোয়াকে গিয়ে বসল।

পুকুরের অন্যধারে কতকগুলো ছেলে ড্রিল করছিল—কাঞ্চনের চেয়ে তারা বয়সে বড়। কুড়ি-বাইশ বছর করে বয়স—এইরকম কাঞ্চনের মনে হল। একজন মাস্টার-গোছের লোক তাদের ড্রিল শেখাচ্ছে।

কাঞ্চনের অদূরে বসে একজন হিন্দুস্থানী দাঁতন করছিল, কাঞ্চন তাকেই জিগ্যেস করল—"এত সকালে ওরা ড্রিল করছে কেন? ওরা কারা?"

হিন্দুস্থানীটা উত্তর দিল—"উ-লোক সব হোল্‌টিয়ার হ্যায়।"

হোল্‌টিয়ার কী রে বাবা! ব্যাপারটা কাঞ্চনের কাছে কিছুমাত্র পরিষ্কার হল না। সে জিগ্যেস করল, "কোন্ ইস্কুলমে পড়তা হায় ও-লোক?"

"ইস্কুলমে? উ লোক্ পড়াশুনা, ইস্কুল-কালিজ তামাম ছোড় দিয়া।"

পড়াশুনো, স্কুল-কলেজ সব ছেড়ে দিয়েছে? ওদের আর বই মুখস্থ করতে হয় না, অঙ্কও করতে হয় না! বা রে! এ তো ভারি মজা! কাঞ্চন ভাবতে লাগল—সে-ও ড্রিলের খাতায় নাম লেখাবে নাকি!

অদূরে জলের মধ্যে হঠাৎ একটা ঘাই মারতে দেখে কাঞ্চন চমকে উঠল—"পুকুরের মধ্যে কী আবার!"

হিন্দুস্থানীটা কাঞ্চনের দিকে কৃপার চক্ষে তাকিয়ে বললে—"মছলি।'

ওমা! তাই তো! ইয়া-ইয়া প্রকাণ্ড মাছ জলের তিন-চার সিঁড়ি নিচে অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; গিয়ে পাঁজাকোলা করে একটা ধরলেই হয়। এতবড় পুকুরটা কি এমনি আছে বোঝাই? কেউ কি এদের ধরে খায় না? মাছগুলোর প্রাণে একটুও ভয় নেই তো! এরকম কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন কাঞ্চনের মুখে এল, সে হিন্দুস্থানীটাকে জিগ্যেস করতে যাবে, দ্যাখে—সে তখন দাঁতন সমাধা করে চলে যাচ্ছে। কী করে কাঞ্চন! চুপ করে ভাবতে লাগল। মাছগুলো পুকুরের জলের মতো কাঞ্চনের মনের তলদেশও যেন আলোড়িত করতে লাগল।

আট

কাঞ্চন খানিকক্ষণ সেই পুকুরের ধারে বসে হোল্‌টিয়ার ও মাছদের ড্রিল দেখল। তারপর সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূরেই একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে চায়ের গন্ধ এসে কাঞ্চনের নাকে লাগল। বাহ্ চমৎকার তো! কাঞ্চন মুখ তুলে দ্যাখে—সেই দোকানের টেবিলে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। এই খবরের কাগজ থেকে তো মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যায়! কাঞ্চন টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

বাহ্, এ যে 'বসুমতী' দেখছি! এত ছোট কেন? তাদের বাড়ি ফি-হপ্তায় যে বসুমতী যায়, সে তো এর চার ডবল। তার আধখানায় শুয়ে আধখানা চাদরের মতো গায়ে ঢাকা দেওয়া যায়। সেই বসুমতী এত ছোট হয়ে গেছে! কাঞ্চন কিঞ্চিৎ দুঃখবোধ করল।

"চা দেব আপনাকে?"

কাঞ্চন মুখ তুলে দেখল, দোকানের একটি চাকর তাকে সম্ভাষণ করছে। 'আপনি' সম্ভাষণে সে অত্যন্ত বিগলিত হয়ে গেল। বললে—"তা দাও!"

"টোস্ট দেব?"

'টোস্ট? তা, দিতে পারো।"

কাঞ্চন মনে-মনে বললে—টোস্ট আবার কী? কখনো তো কানে শুনিনি! যাই হোক, খাদ্য নিশ্চয়ই। আর যা-কিছু খাদ্য, তাতে কাঞ্চনের অরুচি নেই।

"দুখানা টোস্ট দিই তবে। আর মামলেট?"

"মামলেট?"

"মামলেটও হতে পারে, পোচও হতে পারে—যা আপনি চান!"

এ বলে কী! মামলেট, আবার পোচ! এরকম অদ্ভুত নাম তো কাঞ্চন শোনেনি কখনো! বলল—"একটা মামলেট আর পোচ।"

কাঞ্চন কাগজের মধ্যে সেই দরকারি খবরটা খুঁজছে, এ-পাতা ও-পাতা ওল্টাচ্ছে, এমন সময়ে সেই লোকটি আবার জিগ্যেস করল—"আপনার টোস্টে কী দেব? গোলমরিচ, না চিনি?"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"দুই-ই দাও!"

এতক্ষণে সেই খবরটি পাওয়া গেছে—ভেতরের একটা পাতার মাথাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ১৯২১ সালের মধ্যেই স্বরাজ দিব'। খবরটা আনুপূর্বিক পড়তে যাবে, এমন সময়ে "দেখি ভাই, কাগজখানা," বলে পাশের ভদ্রলোক কাঞ্চনের হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিলেন।

কাঞ্চন তাঁকে জিগ্যেস করলে—"স্বরাজ হলে কী হবে মশাই?"

"তখন আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না।"

"স্বরাজ হলে সবার সুখ হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"সবাই বেশ ভালো খাবে-দাবে? ভালো পোশাক পরবে?"

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকালেন, তারপরে জোরের সঙ্গে বললে—"নিশ্চয়ই!"

"আচ্ছা, গরিব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো? স্বরাজ হলে তারা ভালো খেতে পাবে, পরতে পাবে?"

"তার মানে?"

"গরিবদের আবর্জনা ঘেঁটে আর পথের এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খেতে হবে না তো?"

ভদ্রলোক হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কাঞ্চন পুনরায় প্রশ্ন করল—"তাহলে গরিব লোকেরাও তিনতলা চারতলা বাড়িতে বেশ আরামে বাস করতে পাবে তো?"

ভদ্রলোক বললেন, "স্বরাজে এসব হবে বলে আমার মনে হয় না! গরিবরা গরিবই থাকবে।"

কাঞ্চন বললে—"মহাত্মা গান্ধী কে?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে গেলেন—"সে কী! মহাত্মা গান্ধীর নাম শোনোনি?"

কাঞ্চন লজ্জার সহিত স্বীকার করল—নাম শুনেছে বটে, তবে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে ভালোমতো কিছু জানে না। যে অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ি, সেখানে কোনো খবরই ভালোমতো বড়-একটা পৌঁছায় না। হ্যাঁ, একখানা খবর-কাগজ

সাতদিন অন্তর তাদের বাড়ি যায় বটে, কিন্তু তার বাবা নিজে পড়ে ফাইল করে রাখেন। কাঞ্চনকে পড়তেও দেন না, সে পড়েও না। একবার তাদের স্কুলের ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাসের ছেলেরা গাঁধির হুজুক না কী নিয়ে মেতে উঠেছিল, তারা বলছিল বটে যে স্কুল বয়কট করবে, কিন্তু সব ক্লাসের সব ছেলে জিনিসটা ভালো করে বুঝবার আগেই হেডমাস্টারমশাই এক মাসের লম্বা ছুটি দেওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

কাঞ্চনের সমস্ত কথা শুনে ভদ্রলোক তখন তাকে গান্ধীজির জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বোঝাতে লাগলেন। কাঞ্চন অভিভূতের মতো শুনতে লাগল।

গান্ধীজি রোজ মাত্র ছ-পয়সার খেয়ে থাকেন শুনে কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলল—"বলেন কী! মোটে ছ-পয়সা? কী খান তিনি?"

"কেবল ছাগলের দুধ। রোজ দেড় সের।"

" তা তো ছ-পয়সায় হবে না! দেড় সের ছাগলের দুধের দাম আমাদের গাঁয়েই তো দেড় টাকা।"

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—"তাহলে ওটা বোধ হয় বাজেকথাই হবে। আমি কিন্তু ওইরকম শুনেছিলাম।"

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বললে—"না, বাজে কথা নয়, ঠিক হয়েছে। ছাগলকে বোধ হয় ছ পয়সার ঘাস খাওয়ান। সেই ঘাসে দুধ হয় তো!"

ভদ্রলোক বললেন—"তাই হবে তাহলে। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।"

গান্ধীজির গল্প শোনবার অবসরে অজ্ঞাতসারে কাঞ্চন টোস্ট, পোচ, মামলেট ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করছিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললে—"আহ্, ভারি গরম!"

ভদ্রলোক পেয়ালার গায়ে হাত দিয়ে বললেন—"গরম কোথায়? এ তো জুড়িয়ে গেছে।"

"জুড়োয়নি এখনো, মুখ পুড়ে গেল।"

"তাহলে প্লেটে ঢেলে খাও।"

"খাচ্ছি। আমি শুধু ভাবছি, গান্ধীজি এত কষ্ট করে যে স্বরাজ আনবেন, তা কেবল বড়লোকদেরই স্বরাজ হবে। গরিবদের দুঃখ আর ঘুচবে না।"

"ক্রমশ ঘুচবে, ক্রমশ।"

একটু পরে ভদ্রলোক বললেন—"খাওয়া হয়েছে? চলো এবার ওঠা যাক্।"

"হ্যাঁ, চলুন।"

ভদ্রলোক ও কাঞ্চন উঠতেই দোকানের লোকটি বললে—"খোকাবাবু, আপনার দামটা দিলেন না?"

কাঞ্চনের এতক্ষণে হুঁশ হল। সে বললে—"দাম? এই যাহ্, আমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই! এই দ্যাখো—" বলে সে শূন্য পকেটে হাত পুরে দিল!

পকেটের শূন্যতা সম্বন্ধে তার মনে কোনো সংশয় ছিল না, কেবল দোকানদারকে নিঃসন্দেহ করার জন্যেই তার এই প্রয়াস।

কিন্তু নিঃসন্দেহ হয়ে দোকানদার নিরস্ত হল না; বরং তার ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেল। সে বললে—"সে কী! তুমি যে অনেক খেয়েছ!"

'আপনি' থেকে 'তুমি'! কাঞ্চন ভারি চটে গেল; সে বললে—"তুমি আমাকে খাওয়ালে কেন? আমি তো খেতে চাইনি। আমি তো খবর-কাগজ পড়তে এসেছিলুম—।"

"শুনছেন বাবু, শুনছেন ছোঁড়ার কথা? উনি খেতে চাননি! আপনি তো আগাগোড়াই সব দেখেছেন—"

ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কাঞ্চন এবার নিজেকে অপমানিত মনে করল। সে বললে—"তা খেয়েছি তো কী হয়েছে? ধার থাকল তবে।"

"ধার থাকল! তোমাকে চিনি না, জানি না, তোমাকে ধার দেয় কে?"

"তা আর কী হবে, পয়সা নেই যখন! লিখে রেখে দাও। দেবী গাঙ্গুলীও লিখে রাখে।"

ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বললেন, "কত হয়েছে?"

দোকানদার বললে—"দুখানা টোস্ট, একটা পোচ, একটা মামলেট, এক কাপ চা—চার পয়সা, আর পাঁচ পয়সা—ন-পয়সা, আর চার পয়সা, হল গিয়ে তেরো পয়সা, চায়ের তিন পয়সা—একুনে চার আনা।'

"এই নাও চার আনা। হল তো?" পয়সা চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাকে বললেন—"কোথায় যাবে তুমি?"

কাঞ্চন বললে—"কোথাও না!"

"এসো তবে, এই পার্কে খানিকক্ষণ বসে গল্প করা যাক।"

নয়

কাঞ্চন একটু আগে যে পুকুরটা পরিত্যাগ করে এসেছিল, তারই ধারে তারা দুজনে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

কাঞ্চন মনে-মনে ভারি বিস্ময়বোধ করছিল। একজন অচেনা ছেলের জন্য এতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে এর আগে সে কাউকে দেখেনি। ত্যাগীর আসনে ভদ্রলোককে গান্ধীজির ঠিক পরেই সে স্থান দিল। এককথায় একেবারে চার আনা! চার আনা তো কম পয়সা নয়! ষোলো দিনে জমে! বাবা রোজ একটি করে পয়সা তাকে দেন, সে তাই মা'র কাছে জমায়। অনেকগুলো জমলে তাই দিয়ে তখন ঘুড়ি-লাটাই কিংবা ছিপ-হুইল ইত্যাদি কেনে।

সে এখন বড় হয়েছে—এই অজুহাত দেখিয়ে সে একবার বাবার কাছে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে, এক পয়সায় তার আর চলে না, ওটা দু পয়সা করা হোক। বাবা তার বড়ত্বে বিশ্বাস করলেন কিনা ঠিক বোঝা না-গেলেও বরাদ্দটা বাড়িয়ে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি দেখা গেল।

বাবা বললেন—"এইখানে সাতহাত মাটি খোঁড়্ দেখি, পাবি একটা পয়সা? পয়সা কি অমনি আসে?"

পয়সা যে শস্তা নয়, এ-বিষয়ে সে বাবার সঙ্গে একমত হতে পারে না, কেননা পয়সার যা-কিছু দুর্লভতা—সে কেবল তার তরফেই; তার বাবার বেলায় সেই পয়সাই অজস্রভাবে অমনি-অমনি আসে।

সে বাবাকে উত্তর দিয়েছিল—"এখানে মাটি খুঁড়লে পয়সা পাব না বটে, কিন্তু কূপ খুঁড়লে হাত-পিছু ছ-আনা করে পাব। অনাদি পরাণ মণ্ডলের বাড়ি কূপ খোঁড়ে, সে পায়।"

ছেলেকে পরাণ মণ্ডলের বাড়ির কূপ খুঁড়তে উৎসাহিত করতে বাবা চান না, তাই মাটি-খোঁড়ার উপমাটা আর তিনি দেন না। আজকাল বলেন—"পয়সা কি গাছে ধরে, যে নাড়লেই টুপটাপ করে পড়বে?"

কাঞ্চন হটবার ছেলে নয়। সে জবাব দেয়—"গাছ নাড়লে পয়সা না পড়ুক, ফল তো পড়বে, সেই ফল বেচলে পয়সা।"

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন—"তবে তাই নাড়ো গে।"

কাঞ্চন অগত্যা চলে যায়, কিন্তু কোনো গাছের কাছে নয়। কাছাকাছি বিস্তর গাছ থাকলেও তাদের দিকে চেয়ে কোনো আশ্বাসই পায় না সে। গাছের বদলে সে মাকে গিয়ে নাড়া দেয়।

পুকুরের অন্যধারে তখনো ড্রিল চলছিল। কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"ওরা-সব হোল্‌টিয়ার, নয় কি?"

"হোল্‌টিয়ার আবার কী? ওরা সব সি.আর. দাশের ভলান্টিয়ার।"

একটু ইতস্তত করে কাঞ্চন বললে, "সি.আর. দাশ কে?"

"সি. আর. দাশকেও জানো না বুঝি?"

কাঞ্চন লজ্জায় চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন—"গান্ধীজি যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের, সি.আর. দাশ তেমনি এই গোটা বাঙলাদেশের। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশ। খুব বড় ব্যারিস্টার—মাসে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়। দেশের জন্যে সমস্ত ছেড়েছেন। গান্ধীজির চেয়েও ওঁর ত্যাগ বড়। ওঁর মতো বিলাসী লোক বাঙলায় ছিল না, বিলেত থেকে ওঁর কাপড় কেচে আসত। দেশের জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য-বিলাস ছেড়েছেন, এখন চটের মতো মোটা খদ্দর পরে থাকেন, তাই সবাই ভালোবেসে ওঁর নাম দিয়েছে 'দেশবন্ধু'। আর তাঁর নাম শোনোনি তুমি!"

কাঞ্চন কোনো সাড়া দিল না, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল! মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বছরে ছ-লাখ! না জানি সে কত! রাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে একদিনে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেলেন দেশের জন্যে! উত্তেজনায় কাঞ্চনের চোখে জল এল। সে শুধু বলল—"আমিও সি.আর. দাশের মতো হব।"

"সে তো ভালো কথা। ওদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে যাও।"

"ওরা কী করে?"

"ওরা এই এখন থেকে শুরু করে সমস্ত দিন সারা শহরে প্যারেড করে বেড়াবে। লোককে দেশি জিনিস কিনতে বলবে। চরকায় সুতো কাটে; জানো তো?"

"হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দু-একজন বুড়ি কাটে।"

"সেই সুতো তাঁতে বুনলে খদ্দর হয়, লোককে সেই খদ্দর পরতে ওরা বলবে।"

"তাহলে তো ভারি মজা!"

"শহরময় ঘোরা আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা! মজা নয়?"

"বাহ্, সে তো চমৎকার! আমি খুব ঘুরতে পারি, খুব চেঁচাতেও পারি।"

"চেঁচাতেও পারো? তাহলে তো তোমার মধ্যে নেতা হবার লক্ষণ রয়েছে, কালক্রমে হবেও তুমি দেখছি!"

"দেখবেন, আমি সি.আর. দাশের মতো বড়লোক হব, আবার তাঁর মতো দেশের কাজে সমস্ত ঢেলে দেব।"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—"টাকা ছেড়ে দেওয়া তো সোজা। দেশবন্ধু শুধু ঐশ্বর্য ছেড়ে বড় হননি, তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত। তুমি দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারবে?"

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে বললে—"নিশ্চয়ই।"

ভদ্রলোক কাঞ্চনের পিঠ চাপড়ে বললেন—"বাহ্, এইতো বাঙলাদেশের ছেলে, এইতো চাই! আচ্ছা, আমি চললাম, বেলা হয়েছে। তুমি এই সিকিটা রাখো, তোমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই!"

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বললে—"কেন আপনি আমার জন্যে খরচ করছেন? আমার পয়সার দরকার নেই।"

"আচ্ছা রাখো তো, বড় হয়ে না-হয় আমাকে শোধ কোরো।"

"তখন কোথায় পাব আপনাকে?"

'আমাকে যদি না-পাও, তোমার মতো কোনো ছোট্ট ছেলেকে সাহায্য কোরো তখন, তাহলেই আমাকে শোধ করা হবে। এই আমার কার্ড, এতে আমার নাম-ঠিকানা আছে। যদি কখনো অসুবিধায় পড়ো, লোকের কাছে পথ জেনে আমার কাছে এসো। এখান থেকে বেশি দূর নয়। আমি এখন আসি।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। একবার মনে হল ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়ি দেখে আসে। আবার ভাবল, কী জানি, তাহলে হয়তো রাগ করবেন। ভদ্রলোককে তার ভারি ভালো লেগে গেল। দেশের জন্য সর্বস্ব দেওয়া তো তার পক্ষে কিছুই না, বোধহয় ঐ ভদ্রলোকটির জন্যেও সে সর্বস্ব দিতে পারে। কাঞ্চনও পার্ক থেকে বেরিয়ে প্যারেডের দলে গিয়ে ভিড়ে গেল—তাদের সবার শেষে।

দশ

ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সমস্ত শহর ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনের পা ধরে গেল, আর গলা গেল ভেঙে।

সকালবেলার দিকে যখন প্যারেড শুরু হয় তখন তার এমন ভালো লাগছিল! লেফট্—রাইট্—লেফট্—তালে তালে পা ফেলে চলতে কী চমৎকার!

কিন্তু এখন মাথার উপরে সূর্য, রোদ্দুরে ঝাঁঝাঁ—শহরের রাস্তা এমন তেতে উঠেছে যে, পা ফেলা দায়। কাঞ্চনের এখন মনে হচ্ছে—ধুত্তোর! আর কাঁহাতক ঘোরা যায়? এখন একথালা ভাতের সম্মুখে গিয়ে বসতে পারলে হয়! খেয়ে-দেয়ে বিকেলে রোদ্দুর পড়লে আবার না-হয় একচোট লাগা যাবে।

আরো অনেকক্ষণ টহল দিয়ে অবশেষে তারা একটা পার্কের পাশে এসে দাঁড়াল। পার্কের ওপরেই চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ি; দেখেই কাঞ্চন বুঝতে পারল, এই বাড়িটাই তাদের আস্তানা। তারই সম্মুখে এসে ক্যাপটেন হুকুম দিলেন—"হল্ট!" তারা দাঁড়াল।

"নাম্বার!"

"ওয়ান—টু—থ্রি—ফোর—ফাইভ্—সিক্স—সেভেন—এইট—" ভলান্টিয়াররা নম্বর বলে চলল। কাঞ্চনের কোনো নম্বর ছিল না, চুপ করে রইল।

ক্যাপটেন প্রশ্ন করলেন—"এ ছেলেটি কে?"

ভলান্টিয়ারদের একজন জবাব দিলে—"ও আমাদের নয়।"

লোহার রেলিং দেওয়া গেট ঝনাৎ করে খুলে গেল। ক্যাপটেন তাঁর ভলান্টিয়ারদের নিয়ে মার্চ করে ভেতরে চলে গেলেন। গেট আবার ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল।

কাঞ্চন বাইরে দাঁড়িয়ে গেটের গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের লোকজনদের দেখতে লাগল। ভলান্টিয়াররা জুতো-জামা খুলে ফেলে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। অনেকক্ষণ থেকেই কাঞ্চনের গলা শুকিয়ে এসেছে—এক

গেলাশ জল কেউ দেয় না? সাহস করে চাইবে? ওদের স্নান করা দেখে তার সমস্ত শরীর যেন তৃষিত হয়ে উঠল।

খানিক বাদে সারি-সারি কলাপাতা পড়ে গেল। ভলান্টিয়াররা খেতে বসল। আহ্, ডালটার কী চমৎকার গন্ধ! ভাত কোনোদিনই তার মুখে রোচে না, ভাতের চেয়ে খেজুরগুড়ের পাটালি দিয়ে চিঁড়ে ঢের ভালো; কিন্তু সেই ভাতই যে কত আকর্ষণের বস্তু, আজ তা সে প্রথম অনুভব করল। আহ্, কেউ যদি তাকে একবারটি খেতে বলে। জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কি খেয়েছ?' কিংবা 'তুমি কি খাবে?'

কিন্তু সেরকম প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কেউই তাকে করল না। একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক ওপর থেকে নেমে এলেন। তৎক্ষণাৎ ওধারের দরজা খুলে একখানা মোটর বেরিয়ে এল। তিনি সেই মোটরে উঠে বসলেন।

ইনি বোধহয় সি.আর. দাশের দলের একজন হোমরাচোমরা কেউ হবেন! হয়তো স্বয়ং তিনি হতে পারেন। এঁরও তো পরনে মোটা খদ্দর। লোকটিকে দেখলে ভক্তি হয়। কাঞ্চন তাঁর কাছে গিয়ে ডাকল—"মশাই, ও মশাই!"

মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে দেখলেন। কাঞ্চন বললে—"আপনি কি—আপনি কি সি.আর. দাশ। ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন—"না না। তুমি কি দাশ-মশাইকে দ্যাখোনি? আমি তাঁর দলের একজন। তোমার কী চাই?"

কাঞ্চন বললে—"আমি ভলান্টিয়ার হব!"

ভদ্রলোক কাঞ্চনকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে বললেন—"আমরা আঠারো বছরের নিচে তো ভলান্টিয়ার করি না। তুমি যে বড্ড ছেলেমানুষ!"

"আমি কিন্তু দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"বড় হয়ে বরং দিয়ো।" তারপরই মোটর ছেড়ে দিলে।

কাঞ্চন দেখলে, হৃদয়ের দাম ততটা নেই, যতটা দাম বড় হওয়ার। কোনোগতিকে এক নিশ্বাসে বড় হওয়া যায় না? কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, সে হঠাৎ খুব বড় হয়ে গেছে! ছেলেদের ওপর ভগবানের কী অবিচার দ্যাখো তো! কিছুতেই তাদের তাড়াতাড়ি বড় হতে দেন না! মনে-মনে এইরূপ নানারকম দার্শনিক আলোচনা করতে করতে কাঞ্চন পার্কের ভেতরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

পার্কের অন্যধারে টেবিল-চেয়ার সাজানো হচ্ছিল। কাঞ্চন ভাবতে লাগল—মাঠের মধ্যে টেবিল-চেয়ার! ব্যাপার কী? ক্লাস বসবে নাকি? অত্যন্ত ইচ্ছে—ব্যাপারখানা গিয়ে জানে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং পরিশ্রমে সে এতটা অবসন্ন যে, উঠবার উৎসাহ আর আদৌ ছিল না। যাই হোকগে—বসে বসেই দেখা যাবে এখন।

খানিক বাদে একটা কনস্টেবল এসে তার পাশে বসল। একটু পরেই সে মোটাগলায় গান ছেড়ে দিল—

নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে

"নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে।
আরে—নৌতুন গাসে—"

পাহারাওয়ালায় গান গায়! এই অদ্ভুত দৃশ্যে কাঞ্চনের অত্যন্ত হাসি পেল। হাসি চেপে সে গম্ভীরভাবে বললে—"বাহ্, পাহারাওয়ালা সাহেব, তুমি তো বেশ বাংলা গান গাইছ!"

পাহারাওয়ালা গর্বের সহিত বললে—"হামি আঠ বরেষ বাঙলা মুলুকে আসে—বহুৎ বাঙলা শিখিয়েসে। আমার হিন্দীমে ভি আচ্ছা গানা আছেন, কিন্তু বাংলা গানাই হামি ভালবাসে।—আরে নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন—"

পার্কের দূরবর্তী এক দরজা দিয়ে একদল কনস্টেবল প্রবেশ করল। তাদের আবির্ভাব দেখে এই পাহারাওয়ালার সংগীত-চর্চা অকস্মাৎ থেমে গেল।

কাঞ্চনও উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু নাহ্, তার কিছু খাওয়া দরকার। যা খিদে পেয়েছে! পকেটের সিকিটাকে নাড়তে নাড়তে সে একটা খাবারের দোকানের অন্বেষণে চলল। আহা, সেই লোকটার সন্দেশের দোকান যদি কাছাকাছি কোথাও হয়! কিন্তু চার আনায় ক'টাই বা হবে? তার সন্দেশের ভারি দাম—কোনোটাই চার পয়সার নিচে নয়! আহা, দেবী গাঙ্গুলির দোকানে কী শস্তা! চারআনায় আধসের রসগোল্লা! কেমন বড় বড়, শক্ত—তা খাওয়াও চলে, আবার তা দিয়ে মানুষ মারাও চলে! চারআনার খেলে চারদিন মনে থাকে।

এগারো

দেবী গাঙ্গুলির রসগোল্লার কথা মনে হতেই কাঞ্চনের জিভে জল এল। বাবা কিন্তু দেবীকে বড় ঠাট্টা করেন। সেবার কালীপুজোর সময় বলেছিলেন—"দেখ দেবী, মাঝে মাঝে একটু রকমফের কোরো। তোমার যা গোল্লা, ও গোলা-বিশেষ—দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে কাজে লাগতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোকের পাতে—!" বলে কথাটা শেষ না-করেই বাবা যা হেসেছিলেন! এ-কথায় হাসবার কী আছে, কাঞ্চন তা খুঁজে পায় না। বাবার যেমন!

জগদ্ধাত্রী ভোজনালয়

চলতে চলতে আচম্‌কা ওই কথাগুলো দেখে কাঞ্চন থম্‌কে দাঁড়াল। মন দিয়ে সাইনবোর্ডটা পড়তে লাগল—

"এই যে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল ইত্যাদি দিবারাত্র পাওয়া যায়।"

বাহ্। এ-ই তো সে খুঁজছিল! কাঞ্চন আর ক্ষণমাত্র ইতস্তত না-করে সটান ভেতরে ঢুকে গেল।

"কত? তোমাদের এখানে খেতে ক'পয়সা?"

"তিন আনা। কই, পয়সা দেখি?"

"দেব, আগে খাই।"

"ওসব হবেক নাই বাপু—" বলে আশ্রমের মালিক বিড়বিড় করে বকতে শুরু করল; তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ছেলে-ছোকরাদের এইভাবে খাইয়ে অনেকবার সে ঠকেছে, এখন আগে হাতে পয়সা নিয়ে তবে—ধারে সে খাওয়ায় না।

কাঞ্চন তাকে সিকিটা দিয়ে একটা আনি ফেরত নিল। লোকটার বক্তৃতায় সে মনে-মনে ভারি বিরক্ত হয়েছিল। আগে তো খেয়ে নিক, তারপরে দেখাবে লোকটাকে! ঘরের মধ্যে পছন্দমতো ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে বসে পড়ল। বসতে-না-বসতেই একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"ওহে ছোকরা, ওখানে বসলে যে? ওটা যে আমার জায়গা!"

কাঞ্চন ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোনো বাঙ্-নিষ্পত্তি করল না।

"এ যে নড়েও না, রা-ও কাড়ে না! ও কিত্তিবাস—কিত্তিবাস!"

আশ্রমের মালিক কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়ে সমস্যাটা আগে বুঝে নিল, তারপরে কাঞ্চনকে বললে—"তুমি একটু সরে বসো বাপু, উনি আমাদের বাঁধা খদ্দের—"

"বাঁধা খদ্দের তো অন্য কোথাও বেঁধে রাখোগে। আমি নড়ছিনে।"

ততক্ষণে কাঞ্চনের সম্মুখে ভাতের থালা এসে পৌঁছেছে। কৃত্তিবাস চটে বললে—"তুমি থালাটা নিয়ে ওই ধারে বসো-না কেন?"

"পয়সার বেলা নগদ, আর বসবার বেলা ধারে? তা হবে না।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কাঞ্চন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না-করে থালার প্রতি মনোনিবেশ করল। অগত্যা ভদ্রলোক কাঞ্চনের দিকে কটমট করে চাইতে চাইতে নিজেই অন্য জায়গায় গিয়ে বসলেন।

খাওয়াদাওয়া সেরে কাঞ্চন বেরিয়ে পড়ল। বারোটা পয়সা নিয়েছে বটে, তবে নেহাত মন্দ খাওয়ায়নি। যাক্‌গে ব্যাটা, কাঞ্চন ওকে মনে-মনে মার্জনা করে দিল।

ভোজনাশ্রমের পাশেই একটা ওষুধের দোকান—বড় বড় হরফে ইংরাজিতে লেখা : *Chemist and Druggist*। দোকানের টেবিলে কাঞ্চন দেখল, সকালবেলার সেই কাগজখানার মতো একখানা কাগজ। আজকের খবরটা তো তার পড়া হয়নি। একবার পড়ে দেখলে হোত।

সে আস্তে আস্তে দোকানে ঢুকল। টেবিলের ধারে সাহেবি-পোশাক-পরা অল্পবয়সী একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন।

কাঞ্চন জিগ্যেস করলে—"আপনি কি ডাক্তার?"

"হ্যাঁ, কী চাই?"

"ওই কাগজখানা একবারটি পড়ব?"

"পড়তে পারো।"

"কাগজখানা পড়তে গেলে ওষুধ কিনতে হবে না তো? আমি আগেই বলে দিচ্ছি মশাই, আমার কাছে পয়সা-টয়সা নেই, ওষুধ কিনতে আমি পারব না।"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বললেন—"না-না, ওষুধ কিনতে হবে কেন? কিছু-না-কিনেই তুমি পড়তে পারো।"

ডাক্তার এতক্ষণ একটু অবাক হয়ে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করছিলেন, কাগজখানা তার পড়া শেষ হলে তাকে জিগ্যেস করলেন—"কোন্ স্কুলে পড়ো তুমি? কোন্ ক্লাসে?"

কাঞ্চন গর্বের সহিত বললে—"আমি পড়ি-টড়ি না।"

"এতবড় ছেলে, স্কুলে পড়ো না! কীরকম?"

"পড়তুম। স্বরাজের জন্যে স্কুল ছেড়ে দিয়েছি।"

"বটে! মুক্খু হয়ে থাকলে স্বরাজ হবে?"

কাঞ্চন প্রশ্নের ধাক্কায় প্রথমটা কাবু হয়ে পড়ল, কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু একটু পরেই দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলে—"নিশ্চয়ই! মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—'স্বরাজ মে ওয়েট, বাট—বাট—'কথাটা এখন আমার মনে আসছে না। তার মানেটা এই যে, পড়াশুনার জন্যে অপেক্ষা করা চলবে, কিন্তু স্বরাজের জন্যে আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝেছেন?"

ডাক্তার হেসে বললেন—"মহাত্মা গান্ধী কোথাও একথা বলেননি। ওই তো তোমার সুমুখে কাগজ পড়ে আছে, কোথায় বলেছেন, দেখাও দেখি? মহাত্মা গান্ধী নিজে মুক্খু? সি.আর. দাশ কি মুক্খু? ওঁদের মতো অতবড় বিদ্বান দেশে খুব কমই আছেন, তা জানো?"

কাঞ্চন এবার নিরস্ত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার বলে চললেন—"মূর্খতার দ্বারা যদি স্বরাজ হত, তাহলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে উনত্রিশ কোটিই তো আকাট, কোন্‌দিন স্বরাজ হয়ে যেত তবে! মুক্খু হয়ে থাকলে ভাত আসে, না স্বরাজ আসে?"

কাঞ্চন কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন—"তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। খবরের কাগজ পড়ে তোমার মাথা বিগড়েছে। যাও, এক্ষুনি ইস্কুলে আবার ভর্তি হওগে, ভর্তি হয়ে তবে অন্য কথা। যাও—এক্ষুনি—যাও!"

ভদ্রলোক যেন কাঞ্চনকে তাড়া করলেন। চমকে উঠে কাঞ্চন চেয়ার ছেড়ে একলাফে একেবারে ফুটপাথে।

কিন্তু ফুটপাথে পড়েই তার মনে হল—ছি! পালানোটা কাপুরুষের লক্ষণ। কাঞ্চনের কোষ্ঠীতে কাপুরুষতা লেখা নেই। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"পড়ব না আমি। আপনি কী করবেন? আমি ভয় করি নাকি আপনাকে?"

ডাক্তার হো-হো করে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাঞ্চন সে-স্থান পরিত্যাগ করল। পরিত্যাগ করল বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়, বীরের মতো।

কিন্তু বড় ভাবনায় পড়ে গেল কাঞ্চন। মহাত্মা গান্ধী না-ই বলুন, না-হয় অন্য কেউই বলেছে, তা বলেই তো কথাটা মিথ্যে হতে পারে না! কিন্তু এ ভদ্রলোক যা বললেন, সে কথাগুলোও তো ফ্যাল্‌না নয়! তবে? উল্টোপাল্টা দু'রকম কথার দুই-ই কি সত্যি হতে পারে কখনো? কোন্‌টা সত্যি তাহলে?

সহসা ফেরিওয়ালার চিৎকারে কাঞ্চনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল :

"সাবা—ন, তরল আলতা চাই
মাথার কাঁটা, কিলিপ চাই
হেজলিন চাই, পমেটম চাই—"

কাঞ্চন তাকে থামিয়ে জিগ্যেস করলে—"দেখি কী আছে তোমার?"

লোকটা তার বোঁচকা খুলে কাঞ্চনকে দেখাতে লাগল।

"কী চাই আপনার? সব আছে—সাবান, তরল আলতা, কিলিপ, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন, মাথার চিরুনি, হেজলিন, হিমানি, পাউডার—"

"হ্যাঁ সমস্তই চাই—আমার মা'র জন্যে।"

"তা, কোন্ বাড়ি বলুন, আমি যাচ্ছি।"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে বললে—"আমাদের বাড়ি? সে আমাদের দেশে।"

লোকটা হতাশ হয়ে বললে—"এখানে বাড়ি নয়? কিনবেন-না যদি, তবে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?"

কাঞ্চন আশ্বাস দিয়ে বললে—"কিনব বই-কি! মা'র জন্যে কিনতে হবে—আমাকেই কিনতে হবে, বাবা তো এসব কিনে দেন না কখনো! বাবা বলেন—'এসব বিলাসিতা'। আমি চাই, আমার মা একটু বিলাসিতা করুন। বিলাসিতা করলে মাকে ভালো দেখায়।"

লোকটা কাঞ্চনের কথা শুনে হাসল! বললে—"তুমি তো ছেলেমানুষ! তুমি কী করে কিনবে?"

"কেন? রোজগার করে! আমি তো চাকরি করতেই কলকাতায় এসেছি। তা তুমি তো এই রাস্তা দিয়েই রোজ যাও এই সময়ে—কেমন? প্রথম মাসের মাইনে পেলেই এসব আমি কিনব। কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব। ডাকে এ জিনিস যাবে না?"

"খুব যাবে। ডাকে কী না-যায়! মাশুল বেশি লাগবে কেবল।"

"তা লাগুক। মাশুলের জন্যে আমি কেয়ার করি না! হঠাৎ এসব পেলে মা কীরকম আশ্চর্য হয়ে যাবেন, আমি তাই ভাবছি। সে ভারি মজা হবে।"

লোকটা আবার হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল। কাঞ্চন সেই ভারি মজার দৃশ্যটা একবার মানস-চক্ষে নিরীক্ষণ করে নিল। পিয়ন ব্যাটা মস্ত এক পার্সেল নিয়ে

হাজির হয়েছে তাদের বাড়িতে। কিসের পার্সেল? কার নামে?

বাবা ছুটে বেরিয়েছেন। উঁহুঁ—বাবার নামে তো নয়, মা'র নামে। মা'র নামে এতবড় পার্সেল! বাবার মুখ তখন চুন। তাদের বাড়ি এতবড় পার্সেল কখনো আসেনি। আর যদিই-বা অবশেষে একদিন এল, তা-ও কিনা মা'র নামে! মনে-মনে ভারি হিংসে হয়েছে বাবার। যেমন হিংসে, তেমনি হয়েছে কৌতূহল!

বাবা পিয়নকে তাড়া দিচ্ছেন—"দাও-না আমাকে! আমারই তো বৌ—তারই এসেছে, আমাকে দিতে দোষ কী?" পিওন বলেছে—"উঁহুঁ, হুকুম নেই। রেজেস্টারি কিনা, মা'র সই চাই।"

মা তো অবাক! যা কক্‌খনো আসে না, আসার কল্পনাও তাঁর স্বপ্নে নেই, তাই কিনা এল তাঁর নামে! কী আছে না-জানি ওর মধ্যে!

কে-ই বা পাঠিয়েছে, কে জানে?

সই দিয়ে পার্সেল নিয়ে খুলে দেখেন—ওমা, এ যে সাবান, তরল আলতা, মাথার কাঁটা, কিলিপ, সেফটিপিন, হেজলিন, পাউডার, পমেটম—আরো কত কী! কেবল বিলাসিতা আর বিলাসিতা!

কে পাঠালে? মা যখন ভাববেন—কে পাঠালে! আহ্, তখন কী মজাই-না হবে!

নাহ্, একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে তাকে! তা না হলে কিচ্ছু হচ্ছে না।

ও বাবা! এ আবার কী! এত জল হঠাৎ কোত্থেকে! এ যে দেখি পাইপে করে রাস্তায় জল দিচ্ছে—ভারি চমৎকার তো! কিন্তু আর একটু হলেই তো ভিজে গিয়েছিল আর-কী! যদি ঘুরিয়ে না নিত, তাহলেই নেয়ে উঠতে হত। একটা লোক রাস্তার মুখে পাইপ এঁটে দিচ্ছে, আর একজন কত কায়দায় জল ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চন জল দেওয়া দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কাঞ্চনের হঠাৎ মনে হল—এ তো বেশ কাজ! এ-কাজ করলে হয় না? এ তো কাজ নয়, কাজ-কাজ খেলা।

যদি এ-কাজ পায় সে, খুব কষে রাস্তায় জল দেয়—দিনরাতই জল দেয়—শহরের সব রাস্তায়। পাইপে করে জল ছিটানোয় নিশ্চয়ই খুব আরাম।

যে লোকটা জল দিচ্ছিল কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করলে—"তোমার তো বেশ কাজ হে! তুমি কি দিনরাতই রাস্তায় জল দাও?"

"দু-বার দিতে হয় বাবু, খুব ভোরে আর বিকেলে।"

"বাহ্, বেশ তো! তা ক'টাকা পাও এজন্যে?"

"বেশি না বাবু, মোটে আঠারো টাকা।"

কাঞ্চন অবাক হয়ে বললে—"আ-ঠা-রো টা-কা! সে যে অনেক!"

"অনেক কী বাবু! ওই ক-টা টাকায় আমাদের কি চলে! আমাদের পোষায় না ওতে।"

"তা এ-কাজ কোথায় পাওয়া যায়?"

"মুন্সিপালিতে।"

"সে কোথায়? আমাকে কাল নিয়ে যাবে?"

"খুব! কাল এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, এমন সময়ে আমরা জল দিতে আসব, সেইখানে নিয়ে যাব।"

"শুধু নিয়ে গেলে হবে না, আমাকেও এই কাজ একটা দিতে হবে। আমিও জল দেব রাস্তায়।"

"কাজ দেবার মালিক কি আমরা বাবু? কাজ দেন বড় সাহেব।"

"বেশ, তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেয়ো, কেমন?"

"আচ্ছা।"

লোকদুটো জল দিতে দিতে চলল, কাঞ্চন আর তাদের সঙ্গে গেল না। সে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার একধারে বসে তার আসন্ন এই চমৎকার চাকরির কথাটা ভাবতে লাগল। আহ্, রাস্তায় জল দিতে কী ফুর্তি! এই বোধ হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ! আঠারো টাকাও কম টাকা নয়! ওতে বোধহয় ওই লোকটার বোঁচকার সমস্ত জিনিস কেনা যায়।

সেখান থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটা পোড়ো জমিতে অনেক লোক জমেছিল—জনতার বৃত্তাকার ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল। কাঞ্চনের দৃষ্টি ও পা সেইদিকে আকৃষ্ট হল। অতি কৌশলে এবং কষ্টে সে সেই সঙ্ঘবদ্ধ লোকগুলোর ভেতর দিয়ে গলে একটা ভালো জায়গা দখল করে বসল।

বৃত্তাকারের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মড়ার খুলি, হাড়-গোড় এবং আরো হরেকরকম জিনিস। একজন আলখাল্লাপরা লোক আগড়ম-বাগড়ম মন্ত্র আউড়ে ভেলকি দেখাচ্ছিল। কাঞ্চন ভালো হয়ে জমে বসল।

যে-সে ভেলকি নয়—ভানুমতীর ভোজবাজি। আলখাল্লাপরা লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছিল যে, পেশাদার ম্যাজিকওয়ালাদের সাধ্য নেই যে তার মতো খেলা দেখায়। এমন খেলা পৃথিবীতে কেবল একজন মাত্র জানে এবং সেই হচ্ছে সে নিজে। তার কথায় কাঞ্চনের দৃঢ় বিশ্বাস হল।

একটা ছোটছেলেকে বেঁধে-ছেঁদে একটা বড় চুপড়ির মধ্যে পুরে ডালাটা বন্ধ করা হল, তারপরে চুপড়িটাকে দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা হল।

ভেলকিওয়ালা প্রশ্ন করলে—"ভেতরে আছিস তো?"

ছেলেটা ভেতর থেকে সাড়া দিল। তারপরে ভেলকিওয়ালা একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে নির্দয়ভাবে ডালাটার ভেতর খোঁচাতে লাগল। কাঞ্চনের সমস্ত আত্মা আঁতকে উঠল—ছেলেটা মারা যাবে যে! তারপরে চুপড়ি খুলে দেখা গেল ছেলেটা তার মধ্যে নেই! সে জনতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল কাঞ্চনের পাশ দিয়ে।

কাঞ্চন তো অবাক! এরকম দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখেনি। তখন ভূমিকম্প শুরু হলেও সে টের পেত কি না সন্দেহ।

একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে নির্দয়ভাবে ডালাটার

লোকটা একটা আমের আঁটি পুঁতল, দেখতে দেখতে সেটা হয়ে দাঁড়াল একটা আমের চারা। দেখতে দেখতে তাতে ফল ধরল। একেবারে একটা আস্ত পাকা আম। ভেলকিওয়ালা আমটা কেটে জনতাকে পরিবেশন করতে গেল, কিন্তু ভেলকির আম খেতে কারুর সাহস হল না। কাঞ্চন একটুকরো খেয়ে দেখল—সত্যি, একেবারে আসল আম! অবাক কাণ্ড!

বারো

তারপরে তাসের ম্যাজিক—আরো কত কী! দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেল। এইবার লোকটা সবার কাছে একটা করে পয়সা চাইতে লাগল। অনেকে দিল, অনেকে দিল না। লোকটা কাঞ্চনের কাছে কিছু চাইল না, চাইলে বোধহয় আনিটা দিয়ে দিত।

খেলা ভেঙে গেলে সবাই চলে গেল। ভেলকিওয়ালা তার জিনিসপত্র গুছোতে লাগল—তার ছেলে তাকে সাহায্য করছিল। কাঞ্চন তাকে গিয়ে জিগ্যেস করলে—"আমাকে নেবে তোমার দলে? আমি ম্যাজিক শিখব।"

ভেলকিওয়ালা বললে—"বেশ শেখাব তোমাকে। আমার সঙ্গে যাবে?"

কাঞ্চন উৎসাহিত হয়ে বললে—"এক্ষুনি।"

লোকটা বললে—"তোমাকে এই পোশাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাকে পুলিশে পাকড়াবে। তোমায় জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-পিরান পরতে হবে—পারবে তো?"

"খুব। দাও-না একটা লুঙ্গি, আমি এক্ষুনি পরছি।"

এখন নয়। এখানে লোকজন তোমাকে পরতে দেখবে! কাল সকালে আমার আস্তানায় যেয়ো। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে সিঁদুরিয়াপট্টি; সেখানে ইউসুফ ভেলকিওয়ালার নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে যেয়ো।"

লোকটা চলে গেল। কাঞ্চন তাকে জানাল যে, কাল ভোরে সে নিশ্চয়ই যাবে।

সামনের দোকানের ঘড়িতে কাঞ্চন দেখল—এগারোটা। ওহ্, অনেক রাত হয়ে গেছে! এ পর্যন্ত সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। উদরের মধ্যে একটা তীব্র ক্ষুধার প্রেরণা এতক্ষণ পরে সে অনুভব করল। অবিলম্বেই কিছু খাওয়া তার দরকার।

একটা মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে সে বললে—"ওগুলো কী তোমার? লুচি তো? দাওনা চার পয়সার।"

"পুরি নেহি—উ কচৌরি।"

"দাও, কচৌরিই দাও চার পয়সার।"

মিঠাইওয়ালা তাকে একটা ঠোঙায় করে দু'খানা কচুরি আর একটুখানি আলুর তরকারি দিল। তারপর আনিটা হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলে—"তুমি হিন্দু?"

"হ্যাঁ।"

ঠোঙাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আনিটা ফেরত দিয়ে বললে—"ই আনি নেহি চলেগা। সিসা হ্যায়।"

"বা-রে!" কাঞ্চনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

"ঠক্‌লানেকা জায়গা নেহি মিলা?" বলে মিঠাইওয়ালা তাকে অনেক গালমন্দ দিল। একমুহূর্তে চারধারে অনেক লোক জমে গেল। একে দারুণ ক্ষুধা, তার ওপরে এত লোকের সামনে অপমান—কাঞ্চনের চোখ ফেটে জল আসবার মতো হল। সে আর সেখানে দাঁড়াল না।

খাওয়া না-হয় না-ই হল, শোয়া তো দরকার; কিন্তু কোথায় শোবে? এত রাতে কার বাড়ি আশ্রয় পাবে? তা ছাড়া খাদ্যই হোক, আর স্থানই হোক—কিছু ভিক্ষা করতে তার লজ্জা করে। "আমাকে কিছু খেতে দেবে?"—একথা মুখ ফুটে বলতে তার মাথা কাটা যায়। সে ভাবলে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেই আজ রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু ঘোরেই-বা আর কতক্ষণ? আজ সকাল থেকে সমস্ত দিনটাই তো ঘুরছে, তাছাড়া ঘুমে তার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করছিল।

কাঞ্চন দেখল, দু-ধারের ফুটপাথে বিস্তর লোক শুয়ে আছে। যতদূর সে হাঁটল, দেখল কেবল লোক আর লোক। এদের বোধহয় ঘরবাড়ি নেই—এরা বোধহয় পথে শুয়েই জীবনটা কাটায়। সে-ও কেন-না ফুটপাথে শোবে?

কাঞ্চন একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, কাল রাত্রে বিয়েবাড়িতে কী আরামেই-না কেটেছে! আর আজ এই ফুটপাথে!

"এ কে এখানে?"

একজন ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কাঞ্চনকে সেখানে শয়ান দেখে বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন।

কাঞ্চন ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে—"আমি।" তার কথোপকথনে বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

"তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এখানে শুয়ে? এসো, আমার সঙ্গে এসো।"

অগত্যা কাঞ্চন উঠল। বলল—"কোথায় শোব? আমার শোবার জায়গা নেই।"

"রাস্তায় যত ছোটলোকে শোয়, তাদের সঙ্গে—ছিঃ! তুমি এসো আমার সঙ্গে।"

কাঞ্চন ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চলল। যাক, তাহলে সত্যিই ভগবান আছেন! একটু আগেই ভগবানের ওপর তার যা অভিমান হচ্ছিল! এইতো তিনি আজ রাত্রের মতো খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আর কতদূর হাঁটতে হবে? ভদ্রলোকের বাড়ি কতদূর আর? কাঞ্চনের পা আর চলে না; তবু গরম ভাত আর উষ্ণ বিছানার লোভে কোনোরকমে সে হাঁটছিল। ভদ্রলোক যা তাড়াতাড়ি চলেন! কাঞ্চনকে তাঁর সঙ্গে প্রায় দৌড়োতে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা পার্কের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক থামলেন। বললেন—"পার্কের গেট যে বন্ধ দেখছি। যাক গে, তুমি টপকে যাও।"

"টপকে? কেন?" কাঞ্চন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক আবার বললেন—"ভেতরে যাবে কী করে? গেট যে বন্ধ! টপকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওঠো, আমি ধরছি তোমাকে।"

রেলিং-এর উপর দিয়ে কাঞ্চনকে পার্কের ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"ওই যে সব বেঞ্চি দেখছ, ওই বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে থাকো। কোনো ভয় নেই, কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন, কাঞ্চন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পার্কের ভেতরে পুকুরে গিয়ে একপেট জল খেল। খেয়ে বেঞ্চিতে এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—

কালকের ভোজটা কেমন!

মিনি মেয়েটা বেশ—কিন্তু তার ছোড়দা—

সি.আর. দাশ—সিল্কের চাদর—পকেট কাটা—

মামলেট—হাওড়া স্টেশন—টিঞ্চার আইডিন—

তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তেরো

"ওহে, ওঠো, ওঠো; এটা ঘুমোবার জায়গা নয়! আরে, এর ঘুম যে ছাই ভাঙেই না, কোথাকার আপদ!"

কাঞ্চন তখন প্রকাণ্ড একটা ভোজে বসে গেছে। লুচি, পোলাও, পায়েস, সন্দেশ—নানাবিধ খাদ্য। পরিবেশন করছে আবার মিনি। কিন্তু খাবারও যেমন ফুরোয় না, তার খাওয়াও তেমনি শেষ হয় না!

কিন্তু প্রচণ্ড তাড়নায় তাকে চোখ খুলতে হল।

'বাব্বাহ্! কী ঘুম তোমার? কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়!"

কাঞ্চন দেখল, সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে এবং তার অব্যবহিত সামনে একজন বৃদ্ধলোক অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকছেন। চোখ রগড়ে উঠে সে বেঞ্চির একধারে বসল।

ভদ্রলোক বকে চলেছেন—"সকালে কি পড়ে পড়ে ঘুমোয়? ভোরে ধীরে হাওয়া বয়, গায়ে লাগলে জোর বাড়ে। আজকালকার ছেলেরা যেন কী। আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স, সেই প্রত্যুষে উঠে বেরিয়েছি, আর এইসব জোয়ান ছোকরা কোথায় মাঠে ছুটোছুটি করবে, না—"

কাঞ্চন তাঁর বকুনি থেকে পরিত্রাণ পেতে সেখান থেকে উঠে পুকুরে মুখ ধুতে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘাটের পইঠা থেকে একদৌড়ে কাঞ্চন একবারে ফুটপাথে। কাল যাদের সঙ্গে কাঞ্চন প্যারেড করেছিল, সেই দলটাই—কিন্তু এবার তাদের আগে ও পেছনে অনেক কনস্টেবল।

বাহ্, আজকে যে দেখছি পুলিশরাও ওদের সঙ্গে মার্চ করছে! ওরাও গান্ধীর দলে ভিড়ে গেল নাকি?

"না হে, না, ওদের ধরে নিয়ে চলেছে থানায়।"

কাঞ্চনের প্রশ্নের জবাব যে দিল, সে-ও ছেলেমানুষ; তার চেয়ে দু-চার বছরের যদি বড় হয়।

কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করলে—"থানায় নিয়ে চলেছে? তুমি কী করে জানলে?"

"আমি জিগ্যেস করলুম যে। ওর মধ্যে আমার বন্ধু আছে, ওই-যে মাঝখানে, গায়ে লাল খদ্দর, ওই। আজ খুব ভোরে কংগ্রেস-আপিসে খানাতল্লাশি হয়ে গেছে, ওদের সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে।"

"ওদের থানায় নিয়ে কী করবে?"

"জেলে দেবে।"

"জেলে? তাহলে তো ভারি বিপদ! আমি শুনেছি, জেল ভারি খারাপ জায়গা, ভারি ভয়ের!"

"কেন, আমি তো জেলে ছিলুম, কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছি।"

কাঞ্চন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল—এ ছেলেটা বলে কী! তারা দুজনে পার্কের মধ্যে এসে নরম ঘাসের ওপর এক জায়গায় বসল। ছেলেটা তার কারাবাসের কাহিনী বলে চলল, কাঞ্চন হাঁ করে শুনতে লাগল। সেই জেলে আগে সব চোর-ডাকাত, খুনে-বদমায়েশ থাকত, তাদের সব জেল খালি করে মফস্বলের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার—তারাই থাকে।

গল্প চলে, কাঞ্চন আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না, সে বলে উঠল—"বলো কী! একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেলল!"

"ফেলবে না? আমরা চার হাজার লোক আছি যে, তার মধ্যে ছেলে-ছোকরাই বেশি। সকালে ঘুম ভাঙলেই সবাই নিমগাছে উঠে বসি—আমাদের দাঁতন করতে হবে তো!"

"তা বলে—একটা গোটা নিমগাছ?"

"চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিমগাছ আর ক'দিন টেকে?"

"ভারি আশ্চয্যি তো!"

কাঞ্চন মনে-মনে ভাবে, কিন্তু ভাব-প্রকাশের ঠিক কথাটি খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পরে কথাটা পেয়ে অন্য গল্পের মাঝখানেই বলে ওঠে—"কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা, সব-সমেত?"

গল্পে বাধা পড়ায় এবার ছেলেটা একটু বিরক্ত হয়। বলে—"বড় বড় শাখা-প্রশাখা কি আর! গুঁড়িটাও বাদ।"

ছেলেটা বলে চলে—"সমস্ত দিন আমরা হৈ-চৈ আর ফূর্তি করে ঘুরে বেড়াই—অবিশ্যি জেলের মধ্যে। বাইরে তো যেতে দেয় না। আর রাত্রে কেবল ঘরে পুরে রাখে। আমরা থাকি একধারে, আর দাশ মশাই থাকেন আরেক ধারে।"

সি.আর. দাশ! তিনিও জেলে? কাঞ্চনের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছেলেটা চলে গেলে কাঞ্চন নরম ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তার কথাগুলো ভাবতে থাকে।

কিন্তু চিন্তা করা কাঞ্চনের পোষায় না, বিশেষত পেটের মধ্যে খিদে নিয়ে। কাল রাত্রে যে খাওয়া হয়নি, এতবড় কথাটা এমন গল্পের মধ্যিখানে এতক্ষণ কাঞ্চনের মনে পড়েনি, কিন্তু সেই কথাটাই এখন তার উদরের মধ্যে একমাত্র কথা হয়ে উঠল।

আচ্ছা, জেলখানায় খেতে দেয় তো? খেতে দেয় নিশ্চয়, নইলে লোকগুলো কেবল নিমগাছের ছোটখাটো শাখা-প্রশাখা চিবিয়েই কিছু-আর বাঁচে না!

কিন্তু জেল তো পরের কথা, কী খেয়ে আপাতত বাঁচে কাঞ্চন!

কী করে কাঞ্চন—কোথায় যায়? কাল সকালে যে চমৎকার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার কথা কাঞ্চনের মনে পড়ল।

ভদ্রলোক বলেছিলেন—"এই আমার কার্ড রাখো, এতে আমার নাম-ঠিকানা আছে। কখনো অসুবিধায় পড়লে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

কাঞ্চন ভেবে দেখল, আজকের এই অবস্থাটাকে অসুবিধাই বিবেচনা করতে হবে। খালিপেটে থাকার চেয়ে মারাত্মক অসুবিধা আর কী হতে পারে? এরকম অসুবিধায় কাঞ্চন এর আগে আর কখনো পড়েনি। বাড়িতে হলে এতক্ষণে তার তিনবার খাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু সেই কার্ডখানা? পকেটেই তো ছিল—কিন্তু কই? যাহ্, হারিয়ে গেছে! তাহলে আর যাবে কী করে? উৎসাহে কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার মুহ্যমান হয়ে বসে পড়ল।

পেটের মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটছে!

মিনিদের বাড়ি যাবে? সেখানে হয়তো আজ বৌভাত, আজও খুব খাওয়া-দাওয়া। সেখানে গেলেই তো হয়। সেই বেশ। তাদের বাড়ি চিনে যাওয়া বোধহয় খুব শক্ত হবে না।

মিনিদের বাড়ির দোরগোড়ায় সেই এঁটোপাতার জঞ্জাল! ভিখিরিরা তার থেকে লুচি, তরকারি, সন্দেশের টুকরো বেছে জড়ো করছে। সেই স্তূপীকৃত ভুক্তাবশেষ কাঞ্চন মানসচক্ষে দেখতে লাগল।

আর যদি সেখানে আজ বৌভাত না থাকে? না-ই থাকল কোনো ভোজ, সে মিনিকে ডাকবে। ডেকে বলবে তাকে। মিনি তার ছোড়দার মতো কি ভোম্বলের মতো নয়, সে নিশ্চয় তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবে। মিনি তার চওড়া বুকের প্রশংসা করে। মিনিকে সে পাঞ্জা কষতে শিখিয়ে দেবে, ছেলেদের জব্দ করার আরো যতরকম প্যাঁচ আছে, সব শিখিয়ে দেবে, হ্যাঁ!

মিনির কাছে গিয়ে যদি তাকে শেখানোর এই প্রস্তাব করে তাহলে সে নিশ্চয়ই ভারি খুশি হবে। তাকে নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবে, তাদের মা'র কাছে। তাদের মা না-জানি কী রকম! তার মা'র মতো কি? খেতে সে চাইবে না, কিন্তু না-চাইলেও মিনি জোর করে তাকে খাওয়াবে নিশ্চয়।

হ্যাঁ—তাই তো! ঠিকই হয়েছে তবে। আজ সকালেই তো সে স্বপ্ন দেখেছে যে, মিনি তাকে খাওয়াচ্ছে! মা বলেন—ভোরের স্বপ্ন ভারি সত্যি হয়।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল, স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে তিলমাত্র বিলম্ব তার আর সইছিল না। সে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চৌদ্দ

কিন্তু কোথায়? এ রাস্তা, ও রাস্তা, কত রাস্তা ঘুরল, মিনির বাড়ির মতো বাড়িও দু'চারটে তার চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলো মিনির বাড়ি নয়। কলকাতার পথের মতো বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই! এমনকি, স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত তার টলে গেল। কলকাতা জায়গাটা বোধহয় সৃষ্টিছাড়া, এখানে কারুর স্বপ্ন বুঝি ফলে না!

অনেক ঘুরে অবসন্ন হয়ে অবশেষে একটা জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন ধুঁকতে লাগল। যা তেষ্টা পেয়েছে, এক বালতি জল এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পারে! রোদে ঘুরে জল খাওয়া মা'র বারণ, মা বলেন—জিরিয়ে খাবি। কে যেন কবে ভয়ঙ্কর গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেয়ে হঠাৎ সর্দি-গর্মি হয়ে মরেছিল, তাই থেকে মা'র ভারি ভয়। পাছে কাঞ্চন কোনোদিন তাঁর এই নিষেধ অমান্য করে, এইজন্যে তিনি তাকে গা ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন। কাজেই কলের সন্নিকটে রোদে দাঁড়িয়েই কাঞ্চন বিশ্রাম করতে লাগল। দিব্যি না-মানলে মা মরে যায় যদি!

কিছুক্ষণ পরে যখন কাঞ্চনের মনে হল যে যথেষ্ট জিরোনো হয়েছে এইবার জল খাওয়া যেতে পারে, তখন সে কল টিপতে গিয়ে দেখে, এ কী! কল থেকে

যে জল পড়েই না! আরো জোরে, আরো প্রাণপণ করে টেপে—নাহ্, একফোঁটাও না! এ কী হল! একজন লোককে ডেকে বললে—"ভাই, কলটা একটু টেপো না!"

সে উত্তর দিলে—"টিপে কী হবে ভাই? আর কি জল পড়বে নাকি? এগারোটা বেজে গেছে যে! জল আসবে ফের সেই তিনটেয়।"

অ্যাঁ! জলও খেতে পাবে—সেই তিনটেয়?

সেই পার্কের ভেতরে একটা পুকুর আছে বটে, কিন্তু রাস্তা চিনে কি সেই পার্কে পৌঁছুতে পারবে? কলকাতার পথকে তার আর বিশ্বাস হয় না। কাঞ্চনের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে।

দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই, হাঁটতেই হবে। সেই পুকুর—তার আগে, ও তিনটের আগে কোথাও জল নেই।

কিছুদূর গিয়ে দেখে—আহ্, এই তো জল রয়েছে! রাস্তার ধারে লোহার চৌবাচ্চায় চমৎকার জল। জল খেতে যাবে, এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা এসে তাকে বাধা দিলে। মানুষের জন্যে এ জল নয়, ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার জন্যে।

লোকটা বলে কী? ঘোড়ার জন্যে জল আছে, আর মানুষের জন্যে জল নেই?

কাঞ্চন আর দাঁড়াতে পারে না, মাটিতে বসে পড়ে।

সামনে একটা ছোটখাটো মুদির দোকান, দোকানদার কাঞ্চনকে ডাকলে—"খোকা, এখানে এসে জল খেয়ে যাও। খুব তেষ্টা পেয়েছে, না! না না, ঘটি নয়; তোমরা কী? কায়স্থ? তো হোক, তোমার হাত ভারি নোংরা! বলছ—আলগোছে খাবে? তা কেন, তুমি হাত পাতো, আমি ঢেলে দিচ্ছি।"

যে নোংরা হাত ঘটিতে দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত, সেই নোংরা হাতে আকণ্ঠ জল খেয়ে কাঞ্চন অনেকখানি সুস্থ হল; তার মুখ থেকে কথা বেরুল।

"বাহ্, তোমার দোকানে ছাতুও আছে দেখছি যে!"

"তোমার চাই?"

"হ্যাঁ।"

হ্যাঁ তো বলল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মুখ চুন হয়ে গেল! তার অনুৎসাহ দেখে দোকানি প্রশ্ন করলে—"ক পয়সার চাই তোমার?"

"পয়সাই যে নেই আমার কাছে! শুধু একটা আনি আছে, তা-ও আবার অচল!"

"দেখি আনিটা। হ্যাঁ, অচলই বটে, তবে আমার কাছে চলে যাবে। এর বদলে তোমাকে দু-পয়সার ছাতু দিতে পারি।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কাঞ্চন বললে—"তাই দাও।"

একটা শালপাতায় তেল-নুন-লঙ্কা দিয়ে মাখা সেই ছাতু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারের পর কাঞ্চনের কাছে সে-রাত্রের সেই বিয়েবাড়ির ভোজের মতোই উপাদেয় মনে হতে লাগল।

আহার সমাধা করে আর-একঘটি জল খেয়ে কাঞ্চন দোকানিকে জিগ্যেস করলে—"কাছাকাছি কোথাও পার্ক আছে, বলতে পারো?"

"হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়ে নাকের সোজা বরাবর চলে যাও, মির্জাপুর পার্ক পাবে। কেন, পার্ক কী জন্যে?"

"খাওয়া তো হল, এইবার একটি তোফা ঘুম দিতে হবে। কাল থেকে বড্ড হাঁটছি কিনা, আজ আর তা নয়।"

"তুমি দেশ-পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? একলা বুঝি—"

কাঞ্চন দোকানির অনধিকার চর্চার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ সঙ্গত মনে করল না, তার কৌতূহলের কোনো জবাব না দিয়ে সে নাকের সোজা চলতে শুরু করে দিল।

পার্কে গিয়ে একটা ছাদওয়ালা পরিষ্কার বেঞ্চি দেখে শুয়ে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভারি শোরগোল। সমস্ত পার্ক লাল-পাগড়িতে ভর্তি। কী ব্যাপার? মিটিং হচ্ছে নাকি? একধার থেকে সব গেরেপ্তার করছে বুঝি? কাঞ্চন তটস্থ হয়ে উঠে বসল। প্রথমেই তার মনে হল পালাবার কথা; কিন্তু পালাতে হল না, পার্কের ভেতর যে লোকজন ছিল, পাহারাওয়ালারা তাদের বের করে দিচ্ছিল। কাঞ্চনকেও বেরিয়ে যেতে হল।

পার্কের চারপাশের রাস্তায় বেজায় লোকের ভিড়। চারধারেই লোক জমে গেছে; তাদের কারুর বিস্ময়, কারুর উন্মাদনা, কারুর-বা শুধুই কৌতূহল।

একটু পরেই ঘটনাস্থলে ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল। এসেই তারা লোক হটাতে আরম্ভ করে দিল। ঘোড়াদের এবং সোয়ারদের দেখেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেই চাঞ্চল্য ক্রমে আন্দোলনে পরিণত হল এবং সেই আন্দোলন অকস্মাৎ বেগবান হয়ে উঠল—অর্থাৎ সোজা কথায় জনতা প্রস্থানোদ্যত হল।

বাবা বলেন—"শতহস্তেন বাজিনঃ।" চাণক্য ঋষি নাকি বলে গেছেন—"ঘোড়া থেকে একশো হাত দূরে থেকো।" চাণক্য ঋষি বোধহয় এইসব ঘোড়াদের মানসচক্ষে দেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকবেন—তা না হলে ঘোড়া থেকে একশো হাত কেন, একহাত দূরে থাকাও কাঞ্চন কোনোদিন প্রয়োজন মনে করেনি; এমনকি ঘোড়া দেখলে তার পিঠের ওপরে থাকাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। কিন্তু তাদের দেশের ঘোড়া আর এইসব হাতির মতো উঁচু ঘোড়া—এ তো ঘোড়া নয়, ঘোটক।

মা অবিশ্যি শ্লোকটার অন্যরকম ব্যাখ্যা করতেন, বলতেন—"যেখানে বাজি পোড়ানো হবে, সেখান থেকে একশো হাত দূরে থাকবি।" কাঞ্চন চিরদিনই ঘোড়ার সম্মুখে মা'র ব্যাখ্যাটা, আর বাজির সম্মুখে বাবার ব্যাখ্যাটা বেশি পছন্দ করেছে; কিন্তু আজকের এই সঙ্কট-মুহূর্তে সে বাবার ব্যাখ্যাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

কিন্তু, পালাবেই-বা কোথায়? একশো হাত ফাঁকা জায়গাই কি আছে? গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। কাঞ্চন হতাশ-চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখল, মহর্ষি চাণক্যকে অনুসরণ করবার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ঘোড়ারা এদিকপানে এসে পড়তেই অকস্মাৎ সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, সেই জমাট জনতা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছুটতে লাগল। কাঞ্চন দেখল, আর সবার বাবাও ছেলেদের চাণক্য ঋষির উপদেশ দিয়ে রেখেছেন, অতএব ভরসা আছে। কাঞ্চনকে আর কষ্ট করে পা-ও চালাতে হল না, আগের এবং পেছনের চাপে মাটিতে পা না-ঠেকিয়েও সে অনেকটা পেরিয়ে এল।

আকাশে হাঁটার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। যখন মাটিতে তার পা ঠেকল, তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—ঘোড়ারা সব ফিরে গেছে এবং জনতাও ছত্রভঙ্গ।

এতদিনে বাবার একটা কথার মানে বুঝল কাঞ্চন। পুজোর সময় হলেই বাবা পাঁজি দেখতেন, আর মাথা নাড়তেন—"দেবীর এবার ঘোড়ায় আগমন! ফল—ছত্রভঙ্গ! ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে!" তখন কাঞ্চন ভাবত এবার পুজোয় তাকে নতুন ছাতা না-দেবার মতলব। তাই এত ছাতা-ভাঙার অজুহাত। দেবী ঘোড়ায় এলে তার ছাতা ভাঙে কী করে, এটা কাঞ্চন কিছুতেই বুঝতে পারেনি—কিন্তু এখন সে দেখল যে, ঘোড়ার হাতে পড়লে ছাতা কেন, মাথাও ভাঙা সম্ভব। আর ঘোড়ার হাত-ও যা, পা-ও তাই—দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কাঞ্চনের মতে।

কিন্তু যাই হোক, পালানোটা লজ্জার কথা। আস্তে আস্তে এই কথাটা কাঞ্চনের মনে হল। একলা থাকলে সে হয়তো পালাত না, ঘোড়াদের পাশ কাটাত—বিশেষত হস্তদন্ত হয়ে এতদূর পালিয়ে আসাটা—! ঘোড়াও তাদের ব্যবহার দেখেই বোধহয় লজ্জিত হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কী করবে? তার ইচ্ছা না-থাকলেও না-পালিয়ে উপায় ছিল না। যাকগে, সে আবার সেই পার্কের ধারে ফিরে গিয়ে দেখবে, কী হচ্ছে সেখানে; এবার ঘোড়া কেন, হাতি দেখলেও সে দৌড়োবে না, বড়জোর পাশ কাটাতে পারে।

সে ফিরতে উদ্যত, এমন সময়ে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা, যাঁর ডিস্পেন্সারিতে বসে আগের দিন খবরের কাগজ পড়েছিল। তিনি মোটর কারে বসেছিলেন, লোকজনের ছুটোছুটিতে তাঁর মোটর দাঁড়িয়ে গেছল। তিনি কাঞ্চনকে দেখে জিগ্যেস করলেন—"কী হে ছোকরা, খবর কী, তোমাদের স্বরাজ আর কদ্দূর?"

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে গেল, কোনো উত্তর দিল না।

"পালাচ্ছিলে যে? তুমি-না বলছিলে যে, দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারো?"

এবার কাঞ্চনকে জবাব দিতে হল। সে বিরক্ত হয়ে বললে—"দেশের জন্যে পারি, কিন্তু ঘোড়ার জন্যে তো নয়।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"বটে? তো এসো আমার মোটরে। তোমাকে এই গোলমাল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"চাই না যেতে। ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? অনেক ঘোড়ার পিঠেই চড়েছি।"

বলে কাঞ্চন আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে পার্কের দিকে পা চালাতে শুরু করল।

পার্কের কাছে এসে দেখে, আবার চারধারে ভিড় জমে গেছে। দৌড়োদৌড়ির পরিশ্রমে ঘোড়াদের জিভ বেরিয়ে গেছে, তারা নিরুৎসাহ হয়ে হাঁপাচ্ছে।

কাঞ্চন বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—"এইমাত্র এত লোক তাড়াল, আবার লোক জমে গেছে!"

সোনার চশমা-পরা একজন লোক বললে—"কলকাতা শহর, এখানে লোক কি কম? একজন পিছলে পড়লে দুশো লোক দাঁড়িয়ে যায়, মোটর-চাপা পড়লে দু-হাজার! এখানে ভিড় তাড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা কি সোজা কথা?"

কাঞ্চন জবাব দিলে—

"এই লোক কেহ নাহি দিতে পারে তেড়ে।
যতই করিবে তাড়া, তত যাবে বেড়ে॥"

পনেরো

কাঞ্চন তখনো সেই অতিকায় অশ্বগুলোর দিকে তাকিয়ে। ঘোড়াগুলোকে তার আন্তরিক পছন্দ হয়েছিল। এদের পিঠে চড়তে না-জানি কী আরাম। দেশের বেঁটে-বেঁটে টাট্টু বিস্তর চাপা গেছে, একটা ঢ্যাঙালোকের পক্ষে সে-ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার মানে—পায়ে হেঁটে যাওয়া। দস্তুরমতো মাটিতে পা ঠেকে। কিন্তু এই ঘোড়ায় যদি চাপা যায়, তবে যতই ঢ্যাঙা হোক-না কেন, মাটিতে পা ঠেকার আর ভয় নেই। বরং ভয় এই, লোকের মাথায়-না ঠেকে যায়।

আচ্ছা, সার্জেন্টদের চাকরি কি পাওয়া যায় না? বেশ কাজ ওদের। বেশ আরামের কাজ। সবচেয়ে ভালো কাজ। সে বিবেচনা করে দেখল, রাস্তায় জল-ছিটোনোর কাজও ভালো বটে, কিন্তু সার্জেন্টের চাকরি পেলে সে-কাজ ছেড়ে দিতে এক্ষুনি সে প্রস্তুত। অবশ্য সার্জেন্টদের বেতন যে কত, তার জানা নেই; যারা জল দেয়, তারা পায় মাসে আ-ঠা-রো-টা-কা। সে অনেক টাকা। সার্জেন্টরা কত পায়, কে জানে। বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। বোধহয় ঘোড়াটাই ওদের বেতন। কিন্তু ভেবে দেখলে ঘোড়ায় চাপতে পাওয়াটাই কি কম হল? কাঞ্চন বিনা-বেতনেই সার্জেন্ট হতে রাজি।

কিন্তু সার্জেন্টের চাকরি পেলে সে-কাজ ছেড়ে দিতে

ঘোড়ারা লোলুপ নেত্রে জনতার দিকে কটাক্ষ করছিল। তারা জিরিয়ে নিচ্ছে কিংবা আবার তাড়া করবার মতলবে আছে, কাঞ্চন তা ঠিক বুঝতে পারছিল না। যদি আবার তাড়া করে, তাহলে সে ভারি রেগে যাবে! একটু আগেই তাদের তাড়নায় পা না-চালিয়ে বেগে চলার অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল, কিন্তু সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অভিলাষ তার আদৌ ছিল না। আকাশপথে বেশি চলাচল ভালো নয়, নিরাপদও নয়—বিশেষ করে স্থলচরের পক্ষে। তাতে করে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবার ভয় আছে। ওখান থেকে সরে পড়াটাই কাঞ্চন সমীচীন মনে করল।

কিন্তু কোথায়ই-বা যাবে। ভিড় ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখে একজন ফেরিওয়ালা আলু-কাবলি হেঁকে চলেছে। কলকাতায় পা দিয়ে অবধি এই অপূর্ব খাদ্যটি বহুবার চোখে পড়েছে, দেখামাত্র তাকে খাদ্য বলে শনাক্ত করতে তার তিলমাত্র বিলম্ব হয়নি এবং তার অপূর্বতা সম্বন্ধেও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা না-থাকায় জিনিসটা কেবল চোখে দেখাই হয়েছে, চেখে দেখা হয়নি।

সে মনে-মনে প্রশ্ন করলে : সকালে যখন অচল আনিটার বদলে দু-পয়সার ছাতু সে কিনল, তখন এই ফেরিওয়ালা ব্যাটা ছিল কোথায়? কাছাকাছি থাকে নি কেন? তাহলে তো সে ছাতু না কিনে আলু-কাবলিই কিনত—আনিটার বদলে দু-পয়সার না দিক এক-পয়সার দিতে কি খুব আপত্তি হত ওর?

এইসব দার্শনিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সে যখন ব্যতিব্যস্ত, সেই সময়ে সকালবেলার আলাপি সেই ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হল। ছেলেটি হন্‌হন্‌ করে চলেছে, কাঞ্চন তাকে ডাক দিলে—"এমন ছুটে চলেছ কোথায়?"

"মিটিং-এ যাচ্ছি। কেন, মিটিং হচ্ছে না?"

"যেয়ো না, যেয়ো না। সেখানে ভারি ঘোড়ার উপদ্রব।"

"তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ তুমি?"

"পালিয়ে আসব কেন? আলু-কাবলি কিনতে এলাম আমি।"

ছেলেটি তাকে ধিক্কার দিলে—"দেশের চেয়ে আলু-কাবলিই তোমার কাছে বড় হল!"

কাঞ্চন অপ্রতিভ হবার ছেলে নয়, বললে—"বাহ্, তোমরা যদি একটা আস্ত নিমগাছ তার সব ছোটখাটো শাখা-প্রশাখাসমেত খেয়ে শেষ করতে পারো, তাহলে আমার বেলা আলু-কাবলি খেলেই দোষ? নিমের চেয়ে আলু-কাবলিটা কি খারাপ হল?"

কাঞ্চনের যুক্তির বহরে ছেলেটি ধাক্কা খেল। সে আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—"নিমগাছের চেয়ে ভালো হতে পারে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে কি দেশের চেয়েও?"

"বা-রে। দেশ সেখানে কোথায়? কেবল মানুষ আর ঘোড়া, ঘোড়া আর মানুষ! দেশ-টেশ সেখানে দেখতে পেলুম না তো!"

ছেলেটি সবিস্ময়ে বললে—"বলো কী!"

"তা-ও আবার মানুষগুলো ঘোড়ার ঠ্যালায় ছুটোছুটি করে মরছিল; কোথায় পালাবে, পথ পাচ্ছিল না। তাই তো আমি বিরক্ত হয়ে চলে এলাম। তাকে যদি মিটিং বলো তো বলতে পারো; কিন্তু আমার মতে সেটা মিটিং নয়, রানিং—। মানুষ আর ঘোড়ার রানিং।"

ছেলেটি বিরক্তি প্রকাশ করলে—"ওগুলো মানুষ নয়, সব গাধা।"

কাঞ্চন ভারি বিস্মিত হল, ছেলেটা বলে কী! রীতিমতো জলজ্যান্ত মানুষ—সেগুলো সব গাধা হয়ে গেল! গাধা তো তার মধ্যে একটাও তার চোখে পড়েনি। অনর্থক দ্বিপদ প্রাণীদের চতুষ্পদে প্রোমোশন দেওয়া সে সঙ্গত মনে করল না। কিন্তু কথা আর না-বাড়িয়ে ছেলেটির মতেই সায় দিলে—"তা হবে হয়তো, তুমি যখন বলছ।"

"তা হবে হয়তো কী? নিশ্চয়ই তাই। গাধা থাকতে দেশের কী আশা বলো?"

"তা বটে; কিন্তু ঘোড়া থাকতেও দেশের কোনো আশা নেই। তা, মিটিং-এ তুমি কেন যাচ্ছিলে?"

"বক্তৃতা দিতে।"

"আরে দূর দূর, বক্তৃতা আবার মানুষে দেয়!"

"কেন? মানুষে দেয় না তো গোরুতে দেয় নাকি বক্তৃতা?"

"বক্তৃতা দিতে হলে দম আটকে আসে, কথা খুঁজে পাওয়া যায় না, কাপড়-জামা সব ঘামে ভিজে যায়। আমাদের ইস্কুলের মিটিং-এ আমি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলাম; জীবনে আর কক্‌খনো দেব না। বাব্বাহ্ কী নাকাল।"

"আমার কিন্তু ভালো লাগে বেশ।"

"ভারি খারাপ কাজ বক্তৃতা দেওয়া। ওর চেয়ে এস্‌এ লেখা ঢের ভালো। অন্য বই থেকে টোকা যায়, কিন্তু বক্তৃতার বেলা কী মুশকিল দ্যাখো, তোমাকে হরদম বলে যেতেই হবে, অথচ টোকবার কোনো উপায় নেই। তার চেয়ে বক্তৃতার শেষে কষে হাততালি দিতে ভারি মজা। আজকাল আমি বক্তৃতা দিই না, হাততালি দিই।"

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বললে—"আমি খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারি। তোমার মতো অমন হাঁপিয়ে উঠি না। অনেক বক্তৃতা দিয়েছি আমি।"

কাঞ্চন ওকে উৎসাহ দিলে—"বেশ তো, তাহলে এখানেই দিয়ে ফ্যালো না কেন একখানা। আমি খুব জোর হাততালি দেব।"

"একজন হাততালি দিলে কী হবে? আর শোনার লোক কই?"

"আরম্ভ করলেই সব এসে জুটবে; কিন্তু ওই আলু-কাবলিওয়ালাকে শোনানো চাই, তোমার বক্তৃতায় দেশের প্রশংসা তো করবেই, সেইসঙ্গে ওর আলু-কাবলিরও

একটা প্রশংসা করে দিয়ো। ও যদি খুশি হয়ে এক পয়সার আলু-কাবলি অমনি আমাদের দিয়ে দেয়!"

ছেলেটিরও এই আইডিয়াটা নেহাত মন্দ লাগল না। সে উৎসাহিত হয়ে বললে—"বেশ হয় তাহলে! হাততালি আর আলু-কাবলি—দু-দুটো লাভ। বেশ, আমি রাজি—"

তার কথা শেষ হতে-না-হতে কাঞ্চন একছুটে পাশের সরু গলি দিয়ে কোথায় যে ভোঁ দিল, দেখা গেল না। ছেলেটি বিমূঢ় হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দূরে এক অশ্বারোহী সার্জেন্টের আবির্ভাব লক্ষ্য করল। অশ্বভীত কাপুরুষ কাঞ্চনের ওপর তার অত্যন্ত ঘৃণা হল। ছিঃ, ভারি ভিতু তো ছেলেটা!

কাঞ্চন ফিরতেই সে জিগ্যেস করলে—"পালালে যে হঠাৎ?"

"বাবার মতো একজন লোক ওই ফুটপাথ দিয়ে আসছিল যেন দেখলুম। পরে দেখলুম—বাবা নয়, তাই আবার চলে এলুম।"

"বাবাকে বুঝি তোমার বড্ড ভয়? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘোড়ার ভয়ে পালালে।"

"হুঁ! ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? দিক-না আমায় ছেড়ে, আমি চেপে দেখিয়ে দিচ্ছি!"

ছেলেটি বড়-বড় চোখ করে জিগ্যেস করলে—"ঘোড়ায় তুমি চাপতে জানো? চেপেছ কখনো?"

"আক্‌ছার!"

"কিন্তু যদি পিঠে নিয়ে ছুট মারে?"

"ছুটলে তো মজা! কিন্তু ছোটে কই! যেসব বেঁটে-বেঁটে ঘোড়া আমাদের দেশের—দশ-ঘা মারলে তবে এক-পা নড়ে।"

"ওহ্, বেঁটে-বেঁটে ঘোড়া! তাই বলো! এ-ঘোড়ায় আর তোমায় চড়তে হয় না—কী উঁচু দেখেছ!"

"উঁচু হল তো কী! হাতিতে যেমন করে ওঠে, তেমনি করে উঠব।"

"কেমন করে?" ছেলেটির বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এই পাড়াগাঁর ছেলেটি কলকাতার ছেলের কাছে নতুন মহিমা নিয়ে দেখা দেয়। ঘোড়াতে তো ও চেপেইছে, হাতিতে চাপতেও ওর বাকি নেই। হাতিতে ওঠা দূরে থাক্, চিড়িয়াখানায় অমন যে জনপ্রিয় মানুষ-বৎসল হাতি, তার কাছে যেতেও তার ভয় করে। যদি দৈবাৎ ভুলে মাড়িয়ে দেয়, তাহলেই তো সদ্য ছাতুত্ব-প্রাপ্তি!

কাঞ্চন অবলীলায় উত্তর দেয়—"কেন, ল্যাজ ধরে উঠব!" সেইসঙ্গে ছেলেটির দিকে কৃপার চক্ষে তাকায়।

ছেলেটি এবার মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে—"কিন্তু তুমি সাইকেল চালাতে জানো না তো! ঘোড়ায় চাপা তো সোজা, সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে হয়।"

"ঢের-ঢের সাইকেল চালিয়েছি।" সাইকেল-চালানো যে একটা বাহাদুরি, কাঞ্চন সে-কথায় আমলই দিতে চায় না।

"কখনো মোটর চেপেছ?"

ছেলেটি রুদ্ধনিশ্বাসে কাঞ্চনের জবাবের প্রতীক্ষা করে। এরই উত্তরের ওপর যেন তার আত্মসম্মান নির্ভর করছে।

কাঞ্চন এবার দমে যায়, মোটরের ওপর ওর ভীষণ লোভ, কিন্তু এখনো চাপবার সুযোগ হয়নি ওর। সেই ডাক্তার হতভাগা বলেছিল বটে তাকে চাপতে, ইচ্ছেও হয়েছিল তার, কিন্তু অমন বিশ্রী লোকের সঙ্গে মোটরে যেতে কেন, স্বর্গে যেতেও তার রুচি নেই—অনেক কষ্টে সে তখন আত্মসংবরণ করেছে। কিন্তু চাপলেই যেন ভালো ছিল, এখন তো সে অনায়াসেই 'হ্যাঁ' বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে দিতে পারত! মিথ্যে করে 'হ্যাঁ' বলতে তার নিজের কাছে মাথা কাটা যায়—সে-কথা সে কিছুতেই বলবে না।

ছেলেটির প্রশ্নকে যে সে গ্রাহ্যই করে না, এমনিভাবে জবাব দেয়—"মোটর তো আমরা খাই। পাবামাত্রই খেয়ে ফেলি।"

যথার্থ উত্তর না-পেয়ে ছেলেটি মনে-মনে চটে যায়। এরকম বদ্ বাক্যবাগীশদের সঙ্গে কথায় কে পারবে? বিরক্ত হয়ে সে অদূরে পাশের বাড়ির রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ে।

ষোলো

কাঞ্চন আলু-কাবলিওয়ালার কাছে যায়—"তোমার এসব তো বহুৎ রোজের বাসি! নইলে কিনতাম দু-আনার।"

শূন্য-পকেটে হাত ভরে দেয় কাঞ্চন।

আলু-কাবলিওয়ালা জবাব দেয়—'পহলে খাকে তব্ দাম দিজিয়ে।"

দু-আনার আলু-কাবলি এপর্যন্ত কোনো ছেলে কেনেনি তার কাছে—উৎসাহ এবং সন্দেহের চোখে সে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে, কিন্তু পকেটস্থ হাতকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না।

কাঞ্চন বলে—"আরে কিনলে তো দাম দেব নিশ্চয়। পহেলা থোড়া চাখ্নে তো দাও, দু-আনার কিনেগা।"

আলু-কাবলিওয়ালা কিছুটা শালপাতায় করে কাঞ্চনকে দেয়। কাঞ্চন ঠোঙাটা নিয়ে রোয়াকে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসে। কোনো কথা বলে না, শালপাতা সমেত সমান অর্ধেক ভাগ করে ছেলেটির হাতে দেয়। ছেলেটি একবার তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কিছুমাত্র আপত্তি না করেই আলু-কাবলির অংশ গ্রহণ করে। নীরবে দুজনের মুখ চলতে থাকে।

শালপাতাটাকে জিভ দিয়ে সুচারুরূপে মার্জিত করে কাঞ্চন ফেলে দিল, বোধহয় খুব দুঃখের সঙ্গেই। সত্যি ভারি চমৎকার খাবার, চেহারা দেখে যেমন সে কল্পনা করেছিল, ঠিক তাই।

কাঞ্চন বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি তার ওপর রেগেছে; আর তার ধারণায় খাবারই হচ্ছে রাগ ভাঙানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যে রাগ কথায় পড়তে চায় না, খাদ্যের মধ্যস্থতায় তা সহজেই অনুরাগে পরিণত হয়। কাঞ্চন তার একটা কারণও আবিষ্কার করেছিল, তা হচ্ছে এই: খাদ্যের দ্বারা দুজনের মধ্যে একটা উদরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার হৃদয় জিনিসটা উদরের খুব কাছাকাছি আছে কিনা, তাই হৃদয়ের সম্বন্ধ হতেও বেশি দেরি হয় না।

কাঞ্চন মনে-মনে পর্যালোচনা করতে লাগল : নাহ্, উদরকে ঠিক হৃদয় বলা যায় না, সে-কথা সত্যি। মেষশাবক বাঘের উদরে স্থান পায়। কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় কি? নাহ্, উদর-হৃদয় এক জিনিস নয়, তবে উদরকে হৃদয়ের দরজা বলা যেতে পারে। আলু-কাবলির দ্বারা ছেলেটির হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে পেরেছে বলে তার মনে হল। তাই এতক্ষণ বাদে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে কথা কইলে—"তোমার নামটি কী ভাই?"

'কনক!"

"কনক? কনক তো ভারি চমৎকার নাম! বলো কী, তোমার নাম কনক! এরকম নাম তো এর আগে শুনিনি। এমন সুন্দর তোমার নাম!"

কাঞ্চনের উচ্ছ্বাস দেখে ছেলেটি বিস্মিত হল। নিজ নামের গুণ-গানে কে-না খুশি হয়? কাঞ্চনকে তার আবার ভালো লাগল; মোটরে না-চাপুক, নামের মর্যাদা সে বোঝে।

কাঞ্চন বললে—"এরকম চমৎকার নাম তো পৃথিবীতে আর একটিও নেই, কিংবা আর একটিই আছে কেবল।"

"কার নাম?" কনক জিগ্যেস করল। তার নামের মতো চমৎকার নাম আর একটা আছে; সেজন্যে সেই অপরিচিত নামধারীর ওপর মনে-মনে তার ঈর্ষা হল।

কাঞ্চন বলে চলল—"কনক! গোল্ড মানে কনক, কোল্ড মানে ঠাণ্ডা, ওল্ড মানে পুরাতন, সোল্ড মানে বিক্রয় করিয়াছিল।"

ছেলেটার মাথায় ছিট আছে নাকি! কনক ভাবে।

"কিন্তু আর একটা নাম আমার মতো আছে, তুমি বললে যে?" কনক জিগ্যেস করে।

"হ্যাঁ। সে নামটাও খুব চমৎকার।"

'কার নাম?"

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়—"কেন, আমার। আমার নাম কাঞ্চন, কনকও যা, কাঞ্চনও তাই—একই মানে।"

"তোমার নাম বুঝি কাঞ্চন? জানতাম-না তো!" কনক একটু ভাবতে থাকে, তারপরে বলে—"যখন এক নাম, তখন আমাদের মধ্যে খুব ভাব হবে না?"

সতেরো

কাঞ্চন বললে—"চলো একটু বেড়াই এধারে-ওধারে। বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে।"

কনক বললে—"আমাদের বাড়ি তো কাছেই, চলো-না কেন, মা খুব খাওয়াবেন। বাবার সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব।"

খাওয়ার কথায় কাঞ্চনের উৎসাহ হলেও বাবার কথায় সে দমে গিয়ে বললে—"বাবাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি না।"

"কেন, বাবারা কি খারাপ লোক?"

নিরাসক্তভাবে কাঞ্চন জবাব দিলে—"সচরাচর।"

বাবাদের ওপর কনকের স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, কেননা পয়সাকড়ি বাগাতে হলে বাবার মতো বস্তু পৃথিবীতে নেই। এই তো সেদিনই, তাদের বয়েজ-ক্লাব থেকে যা চাঁদা উঠেছিল, তাতে আর ক্রিকেট-সেট কেনা হত না—কিন্তু কনক তার বাবাকে গিয়ে ধরতেই 'কার অ্যান্ড মহলানবিশ' থেকে অমন ভালো ক্রিকেট-সেটটা চলে এল, আর চেকটা বাবাই কেটে দিলেন।

কাঞ্চনের কথার প্রতিবাদ করল কনক—"বাবাদের তুমি কিচ্ছু জানো না।"

অভিজ্ঞব্যক্তিসুলভ ঔদাস্যভরে কাঞ্চন বললে—"হাড়ে হাড়ে জানি বাবা।"

"আমার বাবার তুমি কিচ্ছু জানো না! আমার বাবা তেমন নন!"

"তোমার বাবা তোমাকে ক-দিন অন্তর ঠ্যাঙান?"

"কেন, ঠ্যাঙাবেন কেন?"

"তা না-হলে ছেলে মানুষ হয় কখনো? চাণক্য বলে গেছেন কিনা—'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'—কী-সব সংস্কৃত শ্লোক, ও ছাই আমার মনেও থাকে না; বাবা আওড়ান। মানে তার মোদ্দা এই—পাঁচ বছরের পর থেকেই ছেলে পিটোতে শুরু করবে ষোলো বছর পর্যন্ত, তবেই সে ছেলে মানুষ হবে।"

কনক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—"তা না-হলে আর মানুষ হবে না?"

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে—"কী করে হবে—পিটেই তো সবকিছু হয়; যেমন লোহা পিটে হাতুড়ি হয়, সোনা পিটে গহনা হয়, তেমনি ছেলে পিটলেই মানুষ হয়। মানে, ওটা হচ্ছে গিয়ে বাবার মত, আমি কিন্তু এ-কথা বলি না। আমার ছেলের গায়ে আমি মোটেই হাত দেব না, তুমি দেখে নিও।"

"তোমার বাবা তাহলে তোমাকে মারেন?"

"তা কি মারতে দিই? ছেলেবেলায় যা মেরে-ধরে নিয়েছেন—নিয়েছেন। তবে এখনো কয়েক বছর সাবধানে থাকতে হবে আমায়।"

"কেন?"

"এখনো আমার ষোলো বছর হয়নি কিনা!"

"ও! তারপর আর বাবার ভয় থাকবে না বুঝি?"

"ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে একে বাবা, তায় বয়সে বড়, কী করি বলো! কিন্তু বাবার চেয়ে চাণক্য শ্লোককেই আমার বেশি ভয়, ওই শাস্তরটা বাবা মানেন কিনা! তা, তোমার বাবাও তো তোমাকে মারেন নিশ্চয়ই?"

"মোটেই না। আদর করবার সময় ছাড়া গায়ে হাতই দেন না।"

"বলো কী! তোমার বাবা চাণক্যকে মানেন না বুঝি? হায় হায়, তুমি আর মানুষ হবে না!"

"আমার বাবা বলেন—গাধা পিটে ঘোড়া তো হয় ছাই, বরং অনেক ঘোড়া পিটুনির চোটে গাধায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

কাঞ্চন বিজ্ঞতার সঙ্গে বললে—"তোমার বাবার দেখছি শাস্তরটাস্তর পড়া নেই। সমস্কৃত উচ্চারণ করা শক্ত কিনা, সেই ভয়েই পড়েননি।"

কনক গর্বের সঙ্গে বললে—"আমার বাবা ইয়া মোটা-মোটা ইংরেজি বই পড়েন।

হতাশার সহিত কাঞ্চন উত্তর দেয়—"ম্লেচ্ছ হয়ে গেছেন! নাহ্, আর আশা নেই—তোমারও নেই, তোমার বাবারও নেই!"

"না থাকগে, আমার বাবা আমায় কত ভালোবাসেন। বায়স্কোপে, ফুটবল-ম্যাচে নিয়ে যান। আমায় কেমন গল্পের বইয়ের লাইব্রেরি করে দিয়েছেন। সাইকেল আছে, ক্যারম্‌বোর্ড আছে আমার। জন্মদিনে কত উপহার দেন—আমার আসছে জন্মদিনে একটা ফাউন্টেন-পেন দেবেন বলেছেন। পনেরো—প-নে-রো টাকা তার দাম!"

কাঞ্চনের ভারি বিস্ময় লাগে। এরকম বাবাও পৃথিবীতে আছে নাকি! মোটেই চাণক্য শ্লোকের ধার ধারেন না, তার ওপরে কত প্রাইজ দেন আবার! আশ্চর্য তো! তার তো এতদিন মনে হত যে, বাবা নামক মরুভূমিতে মা-ই একমাত্র ওয়েসিস (অল্পদিন হল বই পড়ে এই উপমাটা কাঞ্চন আয়ত্ত করেছে)। এ ছাড়া অন্যবিধ বাবার অস্তিত্ব, কোনোদিন তার কল্পনাতেও আসেনি। বাবা বলতেই তার মনে হয়—'ওরে বাবা!' আর মা? মা বলতেই যেন গা জুড়িয়ে যায়, মনটা মিষ্টি হয়ে ওঠে, ভাবতেও কেমন ভালো লাগে! কিন্তু কনকের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে পৃথিবীতে মা'র মতো বাবাও আছে, যাকে নিঃসন্দেহে মা'র মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে।

তবু কনকের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার আর রুচি হল না। একটা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে পা ঘামিয়ে? মা হলেও বরং কথা ছিল। রাস্তা দিয়ে

দু-সারি যত লোক আছে, তাদের মধ্যে ছেলেরা বাদে প্রায় সবাই তো বাবা—কারুর-না-কারুর। সব বাবাই প্রায় সমান; এদের যে-কোনো একজনকে দেখলেই বাবা-দর্শনের প্রয়োজন মিটে যায়। তাদের গ্রামের যে ক'টি বাবার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, প্রত্যেকেই তাঁরা ছেলে মানুষ করতে বদ্ধপরিকর—নিজেদের ছেলের পিঠেই মহৎ প্রয়াসের বিজ্ঞাপন তাঁরা জাহির করেন। কনক যা বলছে, তা সত্যি হলে বুঝতে হবে যে, ওর বাবাটিই হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া। সচরাচর বাবারা ওরকম হন না।

"দ্যাখো দ্যাখো, একটা দড়া দিয়ে ওরা কী করছে"—বলতে বলতে কাঞ্চন লাফিয়ে ওঠে। পাশের খেলার মাঠে কোনো অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্পোর্টস চলছিল, কাঞ্চন সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। "একটা দড়ি নিয়ে ওরকম কাড়াকাড়ি করছে কেন? খুব দামি জিনিস নাকি?"

"ওদের স্পোর্টস হচ্ছে।"

"সে আবার কী?"

"কেন, তোমাদের গাঁয়ের ইস্কুলে ছেলেরা খেলাধুলো করে না?"

"আমরা ডাণ্ডাগুলি খেলি।"

"বাবা! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে থাকো তুমি?"—এতক্ষণে বাহাদুরি জাহির করবার সুযোগ পেয়ে কনকের মনটা খুশি হয়। স্পোর্টস কাকে বলে জানে না এ ছেলেটা! অদ্ভুত! "ওরা যা করছে, ওর নাম টাগ্-অব্-ওয়ার—বুঝলে?"

বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে কাঞ্চন বললে—"অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। কিন্তু অত টানাটানি করা কেন? দড়ি তো কম নেই, মাঝখান থেকে দু-ভাগ করে নিলেই তো হয়?"

লোকগুলোর নির্বুদ্ধিতা দেখে বিস্ময়ের আতিশয্যে কাঞ্চন এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে, কখন অজ্ঞাতসারে সে একজন মেমসাহেবের ক্ষিপ্রগতির সামনে এসে পড়েছে, তা দেখতেই পায়নি। ধাক্কা খেয়ে কাঞ্চনের হুঁশ হল। তার রাগও হয়ে গেল ভয়ানক। চটে-মটে সে বলে উঠল—"ডোন্ট মেম্।"

মেমসাহেব দুঃখ-প্রকাশ করে বললেন—"আই অ্যাম্ সরি।"

কনকের ভারি হাসি পেল, সে বললে—"তুমি দেখছি ইংরেজিও জানো না! 'ডোন্ট মেম্' আবার কী হে! মেমটা কি কোনো ভার্ব, যে ডোন্ট হবে?"

কী! কাঞ্চন ইংরেজি জানে না! এমন কথা বলে এই পুঁচকে ছোঁড়াটা তার মুখের ওপর! কাঞ্চন তখনই মেমটির কাছে দৌড়ে গেল। পেছন থেকে ডাকতে লাগলো—"হিয়ার মি, হিয়ার মি, স্যার!"

মেমসাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। কনক ভারি হাসতে লাগল—মেয়েছেলেকে বলছে কিনা স্যার!

কাঞ্চন জানে, কাউকে সম্মান দেখিয়ে কথা কইতে গেলে স্যার বলতে হয়, ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের তাই সে বলে। এতে হাসবার কী আছে? কনকের

ব্যবহারে কাঞ্চন অত্যন্ত মর্মাহত হল। মেমটির কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে সে বলল—"আই অ্যাম্ নট্ গ্ল্যাড।"

মেমসাহেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"হোয়াট?"

কাঞ্চন তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়—"ইউ টেল্ ইউ আর সরি, বাট্ আই টেল্ আই অ্যাম অলসো নট্ গ্ল্যাড! ডু ইউ নো?"

মেমটি হাসতে হাসতে চলে যায়। কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে ফিরে আসে। কনক তখনো হাসছে। তার মুখের ওপর বলে দেয়—"ইউ আর ভেরি ব্যাড বয়, আই ডোন্ট্ টক্ উইথ ইউ।" বলে সটান সে রাস্তা পেরিয়ে সামনে যে-গলি পড়ে, তার মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল।

কনকের মুখের হাসি মিলিয়ে আসে। একটু আগেই যে-বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবার কল্পনা তারা করেছে, প্রথম সূত্রপাতেই তা যে এমনি করে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবে, তা ভাবতে পারা যায় না। যাক্‌গে—তার বয়েই গেছে! ভারি গুড্ বয় উনি—অমন একটা মুক্‌খুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়েই গেছে তার! বলে কিনা, 'ডোন্ট মেম'।

এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়ে কাঞ্চন। আনমনে সে চলতে থাকে। ভারি ছোটলোক ওই কনকটা! আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছেন ওর বাবা! কোনোদিন ও মানুষ হবে না। ইংরেজি ও জানতে পারে—মিনির দাদার মতো—কিন্তু মানুষ ও হবে না কোনোদিন, একথা কাঞ্চন হলফ করে বলে দেবে। নিয়মিত প্রহারকে ওর নিত্যকার খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত না করে ওর বাবা ভয়ানক ভুল করেছেন। তাতে কাঞ্চনের আর কী এসে যাবে, কনকেরই ক্ষতি। কাঞ্চনের হাত নিশ্‌পিশ্ করতে থাকে—হঠাৎ তার মনে হয় একেবারে চলে আসবার আগে কনকের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে এলে মন্দ হত না।

—ভঁক্-ভঁক্-ভৌ—

ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একখানা মোটর তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেতর থেকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আর-একটু হলে চাপা পড়তে যে! নিজেও মরতে, আর আমাকেও মজিয়ে যেতে! রাস্তা চলবার সময় চোখ-কানগুলো থাকে কোথায়?"

আরোহীর আর্তনাদ কানে না-তুলে নিষ্পলক নেত্রে সে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে গম্ভীরভাবে সার্টিফিকেট দেয়—"বাহ্, ভারি চমৎকার তো এই গাড়িটা! কলকাতার সব গাড়ির চেয়ে ভালো!"

তার কথা শুনে ভদ্রলোক ভারি কৌতুক বোধ করলেন। বললেন—"তোমার পছন্দ হয়েছে গাড়িখানা? চাপবে একটু?"

কাঞ্চনের লোভ হয়, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কি একবার ভাবে। সন্দেহের চোখে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে সে জিগ্যেস করে—"আপনি ডাক্তারি করেন না তো?"

"না। কেন?"

"ডাক্তারদের আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাদের গাড়িতে আমি চাপতে চাই না।"

"না-না—আমার চোদ্দপুরুষে কেউ ডাক্তার নেই।"

আশ্বস্ত হৃদয়ে কাঞ্চন তখন গাড়িতে উঠে বসে। ভদ্রলোক জিগ্যেস করেন—"তুমি ডাক্তারদের ভয় করো নাকি?"

"উঁহুঁ, ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে ভালো লোক নয় ওরা—যারা ডাক্তার, আর যারা চা বিক্রি করে।"

তোমার পছন্দ হয়েছে গাড়িখানা? চাপবে একটু

ভদ্রলোক একটু অবাক হন, তারপরে বলেন—"যাকগে। ডাক্তারেরা সব জাহান্নামে যাক, ওইসঙ্গে যত চা-ওয়ালারা। এমনকি চা-বাগানগুলো গেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি না-হয় কোকো খেয়েই থাকব। তুমি আমার একটা কাজ করো তো।"

ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ খুলে কাঞ্চনের সামনে মেলে ধরলেন। গাড়ি চলতে লাগল।

"দ্যাখো, এইগুলো পড়ে দ্যাখো। এগুলো সব ঘোড়ার নাম। এর মধ্যে একটা নাম তুমি পছন্দ করো।"

কাঞ্চন ভারি অবাক হয়। এতক্ষণ তো সে ঘোড়ার সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে—আবার এখানেও সেই ঘোড়া! কলকাতার লোকগুলোর কি ঘোড়া-ঘোড়া করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? সে জিগ্যেস করে—"কেন?"

"বলছি পরে। এই দ্যাখো, দশটা নাম আছে। এর মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ?"

কাঞ্চন মনে-মনে ভাবে, ওই ঘোড়াগুলো—যারা তাদের তাড়া করেছিল, তারা তাহলে নেহাত কেউকেটা নয়, ছাপার অক্ষরে ওদের সব নাম বেরিয়ে গেছে! মহাত্মা গান্ধী, সি.আর. দাশের সঙ্গে ওদের নাম ছাপা হয় কাগজে—সামান্য কথা তো নয়! সবিস্ময় কৌতূহলের সঙ্গে নামজাদা ঘোড়াদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করার কাজে সে মনোনিবেশ করল। কিন্তু কী অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম! মানে বোঝা দূরে থাক, বানান করাই শক্ত! ভাগ্যিস ভদ্রলোক ওগুলো রিডিং পড়তে বলেননি। অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা নাম দেখাল।

"মাই মাদার! মাই মাদার কি জিতবে? আশা কম। আচ্ছা, ধরব আমি কিছু ওতে। যদি জেতে, যা পাব, অর্ধেক তোমার! কেমন!"

আঠারো

কাঞ্চন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—"ঘোড়া আবার কী জিতবে?"

"রেস কাকে বলে জানো না বুঝি? রেস কয় প্রকার?"

"জানি না তো!"

"দুই প্রকার। হিউম্যান রেস আর হর্স রেস। আমরা হিউম্যান রেসের মধ্যে, কিন্তু হর্স রেস না-হলে আমাদের চলে না। বুঝতে পারলে?"

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বলল—"না।"

"তার মানে হিউম্যান রেস-এ আমাদের বিশ্বাস ক্রমশ কমে আসছে এবং হর্স রেসে বাড়ছে। মানুষ হলেও ঘোড়াকে ফলো করতে আমরা ভালোবাসি।"

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে—"বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কিনা আমরা ঘোড়ার রাজত্বে বাস করছি, এই তো? একটু আগেই তো টের পেয়েছি, যা ছুটতে হয়েছিল বাব্বাহ্। কিন্তু তখন তো ঘোড়ারাই ফলো করছিল আমাদের!"

"উঁহুঁ, তা নয়, ঘোড়দৌড় কাকে বলে জানো না? ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতে শোনোনি?"

"ও ঘোড়দৌড়? হ্যাঁ, শুনেছি বাবা বলেন—'ওতে বাজি ধরে মানুষ ফতুর হয়ে যায়। ও খেলা ভারি খারাপ!' আমার দাদামশায়রা খুব বড়লোক ছিলেন, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে"—

"ফতুর হয়ে গেছেন? বরাত খারাপ থাকলে অমন হয়। আমার কপাল খুব ভালো, আমি তো প্রায়ই জিতি। এই-যে এসে পড়েছি। ওই হচ্ছে রেসকোর্স। দেখছ, কীরকম লোকের ভিড়! আমি ভেতরে চললুম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসব। তুমি এই গাড়িতেই বসে থাকো, চলে যেও-না যেন। যা দরকার হয়, শোফারকে বোলো।"

চারিদিকে লোক, কেবল লোক। অনেকখানি জায়গা ঘিরে গোল হয়ে লোকগুলো যেন অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তখনো কত লোক আসছে, লোক আসার আর বিরাম নেই। কাঞ্চনের সম্মুখ দিয়ে অনেকগুলো অতিকায় অশ্ব চলে গেল। এইগুলোই বুঝি রেসের ঘোড়া? শোফারকে তিন-চারবার প্রশ্ন করল, কিন্তু সে তার একটা কথারও জবাব দিল না। তার দিকে তাকাল-না পর্যন্ত, যেন তাকে গ্রাহ্যই করল না। কাঞ্চনের ভারি রাগ হল, কিন্তু রেগে আর কী করে? তার ভারি ইচ্ছে হল, ভেতরে গিয়ে ঘোড়দৌড় ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে, কিন্তু কী নিয়ম-কানুন কিছুই জানে না তো! তাকে কি যেতে দেবে? শোফার ব্যাটা যে একেবারে মৌনব্রত নিয়ে বসেছে!

অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে নোটের তাড়া। মোটরে উঠে প্রথমেই একচোট খুব হেসে নিলেন।

"আজ একেবারে আপসেট। ভারি জিতেছি! তোমার টিপ্ ভারি ফলে গেছে! তুমি মাকে খুব ভালোবাসো, না? তোমার মাতৃভক্তির জোরেই জিতে গেলাম। 'মাই মাদার' জিতবে, কেউ ভাবেনি। দশ হাজার চারশ সাতান্ন টাকা—একেবারে রেকর্ড পেমেন্ট!"

"আমি বললুম বলে জিতল! তা কি হয়? এ তো ভারি আশ্চর্য।"

"আশ্চর্য আবার কী? ছেলেদের মধ্যে ভগবান থাকেন। তাই ছেলেদের কথা ভারি ফলে যায়। তোমার মধ্যে দেবতা আছেন, তা জানো? যতদিন ছেলেমানুষ থাকবে, ততদিনই সেই দেবতা থাকবেন—তারপর যত বড় হবে, তত এই শোফার, বাড়ি—না, বাড়ি নয়, চাঙোয়া!"

"চাঙোয়া কী?"

"রেস্তোরাঁ। মানে, চীনেদের হোটেলে—ভারি চমৎকার সব খাবার-দাবার। চপ্ কাট্‌লেট্—ফাউল-কারি—ফ্রায়েড রাইস—আইসক্রিম। তুমি কখনো সেসব খাওনি।"

"মা বলেন—চীনারা সব আরশুলা খায়। আর নেংটি ইঁদুর।"

"ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার। চীনেরা আমাদেরই মতো সভ্য জাত। সভ্য লোকে কখনো ওসব খেতে পারে?"

"চাঙোয়া! নামটা যেন কী রকম!"

"হ্যাঁ, ওদের নামগুলোই খারাপ, আর সব ভালো।"

"আচ্ছা চ্যাংদোলা, এটাও চীনের কথা, নয় কি? আমি তখনই জানতুম। আমি পালিয়ে আসতুম বলে পড়ুয়ারা আমাকে ছোটবেলায় চ্যাংদোলা করে পাঠশালে নিয়ে যেত। আমার যা খারাপ লাগত! এখন বুঝতে পারছি, ওটা চীনদেশের ব্যাপার!"

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন—"ঠিক ধরেছ তুমি। এখন নামো, আমরা এসে পড়েছি।"

সারি সারি কাঠের কামরা চলে গেছে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দার ফাঁকে কাঞ্চন দেখতে পেলে—প্রত্যেক কামরায় লোক খাচ্ছে। কোনোটাতে বাঙালি ভদ্রলোক, বাঙালি মেয়েছেলে—আবার কোনোটাতে সাহেব-বেগম। কাঞ্চনরা একটা কামরায় গিয়ে বসল।

ভদ্রলোক ডাকলেন—"বয়!"

একজন উর্দিপরা লোক এল, তাকে খাবারের তালিকায় দাগ দিয়ে দিলেন।

কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"ওই লোকটার নাম কি বয়? এরকম নাম কেন? ও কি চীনে? ও তো মনে হল যেন আমাদের—"

"হোটেলের যারা খাবার পরিবেশন করে, তাদের বয় বলে। যে বয় মানে বালক, ও সে-বয় নয়, ও হচ্ছে সে বয়ের বাবা।"

ছুরি-কাঁটা দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খাদ্যও এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক ছুরি-কাঁটা চালাতে লাগলেন।

কাঞ্চনও হটবার ছেলে নয়, সে-ও ছুরি-কাঁটা ধরল, কিন্তু খানিক বাদেই দেখল—ও দিয়ে খাবার ধরা যায় না, কিন্তু প্লেট ওল্টাবার পক্ষে ওগুলোই যথেষ্ট। তখন ছুরি-কাঁটা পরিত্যাগ করে হাতকেই এ-বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন মনে করল।

এক-একটা খাবারের এক-এক রকম স্বাদ! আর কেমন সব রহস্যময় নাম! আইসক্রিম জিনিসটাই কী চমৎকার! কাঞ্চনের যেন জন্ম সার্থক হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আহারাদি সমাধা হলে পর ভদ্রলোক একতাড়া নোট কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বললেন—"জিতলে তোমাকে অর্ধেক দেব বলেছিলুম। এগুলো তোমার। চল্লিশখানা একশো টাকার আর একশোখানা দশ টাকার নোট

আছে, মোট পাঁচ হাজার। নাও, ধরো। এই হ্যান্ডব্যাগে রাখো—ব্যাগটাও তোমায় দিলুম।"

কাঞ্চন বিস্ময়ে হতবাক।

"কী ভাবছ?"

"বর্ধমান লাইনের গাড়ি হাওড়া থেকে কখন ছাড়ে?"

"বাড়ি যাবে? অনেক গাড়ি আছে, তবে শেষ গাড়ি ছাড়ে বোধহয় রাত এগারোটায়।"

"সেটাতে চাপলে ভোরবেলায় বাড়ি পৌঁছোব। তবে বর্ধমানে গাড়ি বদলাতে হবে।"

"টাকাগুলো দিয়ে কী করবে?"

"কত কী কিনব! রিস্টওয়াচ, ফাউন্টেন-পেন, সাইকেল, জামা, জুতো, কাপড়, পোশাক। মন্টুর জন্যে বল, ন্যাপলার জন্যে খেলনা, মোটরগাড়ি—এইসব। আর মা-র জন্যে যত বিলাসিতার জিনিস।"

"এসব কিনেও অনেক টাকা থাকবে! তা দিয়ে কী করবে?"

"মাকে দেব।"

"বেশ-বেশ, ভালো কথা। তা, তুমি তো দোকানে দোকানে ঘুরে এ-সমস্ত কিনতে পারবে না, আমার এক জানা লোক আছে, সে অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ করে। চলো তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। সে-ই সমস্ত কিনে, বেঁধে-ছেঁদে স্টেশনে গিয়ে বুক করে দেবে—তোমাকে টিকিট কেটে গাড়িতেও তুলে দিয়ে আসবে।"

সেদিন রাত এগারোটার সময় কাঞ্চনকে হাওড়া স্টেশনের একটি ফার্স্টক্লাস কামরায় দেখা গেল। তখন গাড়ি ছাড়ার সামান্য মাত্র দেরি।

অর্ডার সাপ্লায়ার লোকটি মালের রসিদ কাঞ্চনকে দিয়ে বললে—"সাইকেল ইত্যাদি সমস্ত জিনিস এই গাড়িরই লাগেজ-ভ্যানে চলল, স্টেশনে নেমে এই রসিদ দেখিয়ে খালাস করে নেবেন। আর মা-র জন্যে কাশ্মীরি শাড়ি, জ্যাকেট, গন্ধতেল, সেন্স, নলেন গুড়ের সন্দেশ—ইত্যাদি সবকিছু ওই সুটকেসটায় দিয়েছি, ওটা তো আপনি নিজের কাছেই রাখবেন বললেন। সাইকেলটার পার্টস আর খুলিনি—কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি। স্টেশনে নেমে কুলিদের দিয়ে ফ্রেম খুলে ফেলে তখনি চালানো যাবে—ফুল্ পাম্প করা আছে। আর কী?"

"আর কিছু না। তবে একটা কথা—" কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কাঞ্চন দু'খানা একশো টাকার নোট বের করল।

"আপনার কাছে কিছু চাই না, আমার কমিশন আমি দোকানদারের কাছ থেকে পাব।"

এই হ্যান্ডব্যাগে রাখো—ব্যাগটাও তোমায় দিলুম

"না আপনাকে দিচ্ছি না! আচ্ছা, কলকাতা শহরে কতগুলো ভিখিরি আছে, বলতে পারেন? দুশো? পাঁচশো?"—কাঞ্চন আরো তিনখানা নোট বের করল।

"তা হবে, কেন বলুন তো?"

"এই টাকাগুলো রাখুন। আপনি কাল একটা মোটর ভাড়া করে একটু কষ্ট করে সমস্ত কলকাতা ঘুরবেন। আপনার চোখে যেখানে যে ভিখিরি পড়বে, একটি করে টাকা তাকে দেবেন।"

"টাকা রেখে দিন। এই বাজে খরচ কেন?"

"বেচারারা পেট ভরে খেতে পায় না, রাস্তার পাত কুড়িয়ে খায়।—আমার টাকায় তবু একদিন ভালো-মন্দ ইচ্ছেমতো খাবে। চিরদিনের দুঃখ তো আর আমি ঘোচাতে পারব না!"

"আচ্ছা দিন তবে। এ অপব্যয় কিন্তু। ছেলেমানুষ আপনি, টাকার মূল্য বোঝেন না। গাড়ি ছেড়ে দিল। নমস্কার। আমার নাম, ঠিকানা তো বলেছি। যখন যা দরকার হয়, দয়া করে আমাকে লিখবেন—খুব সযত্নে পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা আচ্ছা। নিশ্চয় লিখব। নমস্কার।"

সুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হুস্-হুস্ করে গাড়ি চলেছে—একখানা কামরায় কাঞ্চন একা। জানালায় মাথা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঞ্চন ভাবছে—মা'র কথা, বাবার কথা, ন্যাপলা ও মন্টুর কথা, মিনির কথা, কনকের কথা। কোথায় রইল কনক, আর কোথায়-বা মিনি! তাদের নাম জানল শুধু, কিন্তু ঠিকানা জানে না। কোনোদিন কি জীবনে আর দেখা হবে তাদের সঙ্গে!

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, টিকিট-চেকারের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর।

"কি বর্ধমান? এখানে গাড়ি বদলাতে হবে?"

"বর্ধমান অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে। টিকিট দেখি। এই স্টেশনে নামতে হবে। একটু পরেই একখানা ডাউন গাড়ি আসবে, সেই গাড়ি বর্ধমান যাবে। গার্ডকে তোমার আগে বলে রাখা উচিত ছিল, তাহলে বর্ধমানে নামিয়ে দিত, ওভ্যার ক্যারেড হয়ে তাহলে এই অসুবিধে পোহাতে হত না!"

"যাক, যা হবার হয়ে গেছে। নরম গদি-আঁটা বিছানায় শুয়ে ভারি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কোথা দিয়ে রাত কেটেছে, টের পাইনি। আচ্ছা, এই ডাউন গাড়িতে চাপলে আমার বাড়ির স্টেশনে কখন পৌঁছোব?"

"এই—দুপুর নাগাদ। বর্ধমানে নিশ্চয়ই করেসপন্ডিং ট্রেন পাবে, তবে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে, সেই সময় 'রেস্টুরেন্ট কার'-এ খেয়ে-দেয়ে নিতে পারো।"

কাঞ্চন যখন তার বাড়ির স্টেশনে পৌঁছল, তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সেদিন গাড়ি একটু লেট ছিল। রসিদ দেখাতেই স্টেশনমাস্টার বললেন—"এসব মাল তো আজ সকালের গাড়িতেই এসে পড়ে রয়েছে। তুমি বুঝি গাড়ি বদলাবার সময় গাড়ি ধরতে পারোনি?"

"প্রায় সেইরকম! দেখুন আমি শুধু আমার সাইকেলটা এখন নেব। বাকি জিনিসপত্র পরে লোক এসে নিয়ে যাবে; কিংবা আপনি যদি একটা কুলি দিয়ে পাঠিয়ে দেন—"

"তাই দেব।" বলে স্টেশনমাস্টার তার টিকিটখানা নিয়ে চলে গেলেন।

কাঞ্চন সাইকেলটার প্যাকিং খুলে পিছনের ক্যারিয়ারে সুটকেসটাকে শক্ত করে বাঁধল। তারপরে সাইকেল চেপে কাঞ্চন বোঁ বোঁ করে তার বাড়ির দিকে পাড়ি দিল।

উনিশ

বাড়ি পৌঁছে কাঞ্চন একবার ভালো করে চারিদিকে চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। চাকরটাকেও দেখতে পেল না। সাইকেলটাকে বাইরে রেখে পা টিপে টিপে ভেতরে গেল। মন্টু, ন্যাপলা—এরাই-বা গেল কোথায়? হয়তো পাড়ায় কোথাও খেলতে গেছে। মা? ঐ যে মা, একা বই হাতে নিয়ে—ঘুমুচ্ছেন নাকি?—জেগেই আছেন যে!

কাঞ্চনকে দেখে মা আনন্দে চেঁচাতে যাবেন, কাঞ্চন তাঁর মুখ চেপে ধরল—"মা, চুপ। বাবা কোথায়?"

"উনি? খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছেন।"

"বেঁচেছি তাহলে!"

"তোর ওপর ওঁর আর রাগ নেই। তুই চলে যাওয়াতে ওঁর মন খারাপ হয়ে গেছে। এ-ক'দিন ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারেননি। আমি তো কেঁদে বাঁচিনে! কোথায় ছিলি তুই? তোর জন্যে আশপাশের গাঁ সব তোলপাড় হয়ে গেছে—তোর ক্লাসের সব ছেলেদের বাড়ি—"

"আমি বুঝি এখানে ছিলুম? আমি যে কলকাতায় গেছলুম!"

"কলকাতায়! অবাক করলি! পয়সা পেলি কোথায়?"

"অমনি। আমার কি কোথাও যেতে পয়সা লাগে? কত টাকা রোজগার করে আনলুম—তোমার জন্যে।"

মা-র যেন বিশ্বাস হয় না। অতটুকু ছেলে কাঞ্চন, সে করবে টাকা রোজগার!

"বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখো সোনার হাতঘড়ি। এই দ্যাখো ফাউন্টেন-পেন—এইটেরই দাম পনেরো টাকা। কেমন নতুন ফ্যাশানের জুতো দ্যাখো!"

"তাই তো!" মা একেবারে অবাক!

"কিন্তু তোর গায়ে এ কী মণি! চটের মতো জামা-কাপড় পরেছিস! এ তোকে মানাচ্ছে না!"

"এ বুঝি চট? তুমি হাসালে মা! এ যে খদ্দর! খদ্দর পরলে ভদ্দর হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন। গান্ধী কে জানো? খুব মহৎ লোক, বয়সে খুব বড় তবু যেন ছেলেদের মতো মন!"

"তা হোক, তবু এ কাপড় তোর গায়ে সাজে না। তোর জন্যে আমি সিল্কের জামা, তাঁতের কাপড় আনিয়ে রেখেছি।"

"বা-রে, আমি যে প্রথমে ঐসব কিনেছিলুম—কিন্তু ভেবে দেখলুম, ওর চেয়ে খদ্দর ভালো। কনক মোটা খদ্দর পরে, আমিও তাই পরলুম। আমার সে জামা-কাপড়গুলো ট্রাঙ্কে তোলা আছে, বিনোদের জন্যে এনেছি। ওকেই দিয়ে দেব।"

"কনক কে?"

"আমার বন্ধু। তার কথা তোমায় রাত্রে শুয়ে-শুয়ে গল্প করব। তার কথা, মিনির কথা, কলকাতার ভোজের কথা—হ্যাঁ, তোমার জন্যে আমি চমৎকার সন্দেশ এনেছি, তুমি যে লুচি দিয়ে খেতে ভালোবাসো! ট্রাঙ্কে আছে। খেয়ে দেখো, গাঙ্গুলির সন্দেশ তার কাছে কোথায় লাগে!"

"আমার জন্যে তো সন্দেশ আনলি, তোর বাবার জন্যে কী এনেছিস?"

"বাবার জন্যে কী আর আনব? কেবল একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি। জানি, ওটা কোন্ দিন আমার পিঠেই ভাঙবে, তবুও আনলুম।"

"আর মন্টু, ন্যাপলা?"

"ওদের জন্যে বল, ব্যাট, ট্রাইসিকেল, কতরকম খেলনা, পুতুল মোটর-গাড়ি—কত কী! তোমার জন্যে কত গল্পের বই এনেছি! সেসব ট্রাঙ্কে আছে—তিনটে বড় বড় ট্রাঙ্ক বোঝাই কত জিনিস! স্টেশনমাস্টার কুলি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

"এত টাকা পেলি কোথায়?"

"সে তোমায় সব রাত্রে বলব। ধরে নাও যেন, ভগবান আমায় দিয়েছেন। এমন কি হয় না?"

"তা হয়। কলকাতায় কোথায় বেড়ালি? কী কী দেখলি? চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির, শিবপুরের বাগান—এসব দেখেছিস?"

"না, সময় পাইনি। তা ছাড়া কোথায় যে ওগুলো আছে, জানতুমও না। এত তো হেঁটেছি, কোনোদিন পথের ধারেও পড়েনি। পড়লে কি আর না-দেখে ছাড়তাম? তবে, এমন একটা জায়গা দেখে এসেছি, যা কলকাতা গিয়েও লোকে দেখতে পায় না।"

"কী জায়গা রে?"

"রেসকোর্স, সেখানে ঘোড়দৌড় হয়। সেসব রাত্রে বলব। ভারি মজার গল্প। এখন একটা কথা শুনবে! তোমার পায়ে পড়ি মা!" বলে কাঞ্চন সুটকেস খুলে শাড়ি, জ্যাকেট ইত্যাদি বের করে বলল—"এইগুলো তোমায় পরতে হবে মা।"

"এখনই?"

"হ্যাঁ, এখনই আমি দেখব।"

ছেলের আব্দার, কী আর করেন, মাকে পরতে হল। কাঞ্চন বললে—"বাহ্, তোমাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে মা! সত্যি! এইবার এই জিনিসটা মুখে মাখো দেখি! এটার নাম হিমানী—একরকম স্নো। এইবার তুমি কৌচটায় বসো। আমি তোমায় পুজো করব, অঞ্জলি দেব।"

কাঞ্চন নোটের তাড়া নিয়ে মা'র দিকে ছুড়ে দেয়—বৃষ্টির মতো চারিদিকে নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে। মা দুইচক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকেন, তাঁর মুখ থেকে কথা বেরোয় না।

বৃষ্টির মতো চারিদিকে নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে

"কোথেকে এত টাকা পেলুম ভাবছ? সে তোমাকে এককথায় বোঝাতে পারব না। আগে বলো দেখি, রেস কয় প্রকার? দুই প্রকার—কিন্তু সে বোঝাতে অনেকক্ষণ লাগবে। বিশু কাকা যেমন লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছিল-না, আমি একরকম তাই পেয়েছি। না-না, ওগুলো কুড়িয়ো না, অমনি চারিদিকে ছড়িয়ে থাক্। তুমি মাঝখানে বসে থাকো মা!"

মা হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন।

"মা, একটা কথা বলব? তোমার কোলে একটু বসব। আমি বড্ড ভারী হয়ে গেছি, তোমার লাগবে কিন্তু।"

কাঞ্চন গিয়ে মা'র কোলে বসে। মা-র গলা জড়িয়ে ধরে। মা কাঞ্চনের কপালে একটা চুমু খান। কাঞ্চন মা-র বুকে মুখ লুকোয়।

মা-র চোখ দিয়ে জল পড়ে।...

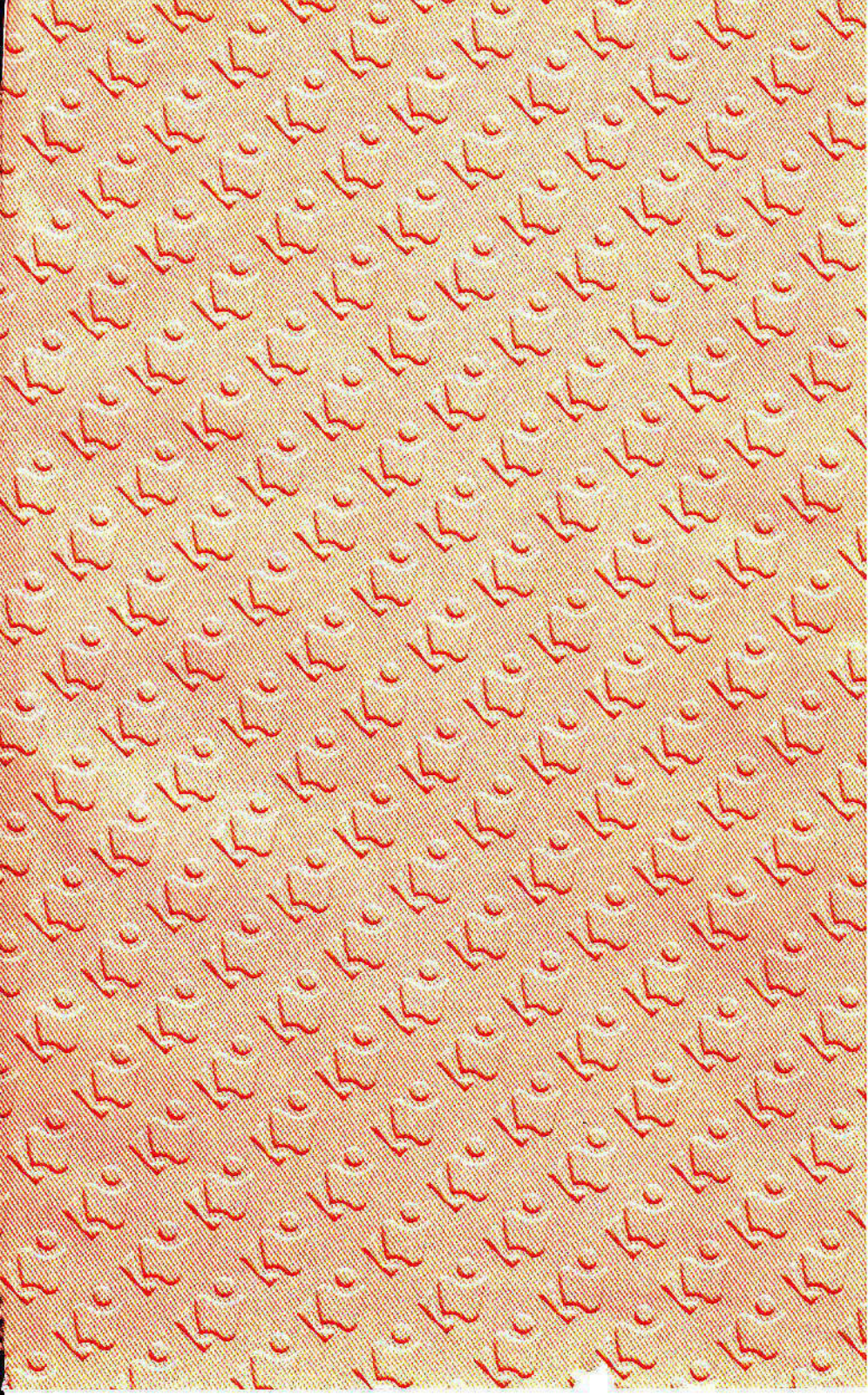

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র**
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়